মধ্যরাতের অভিসার

সুমন চৌধুরী

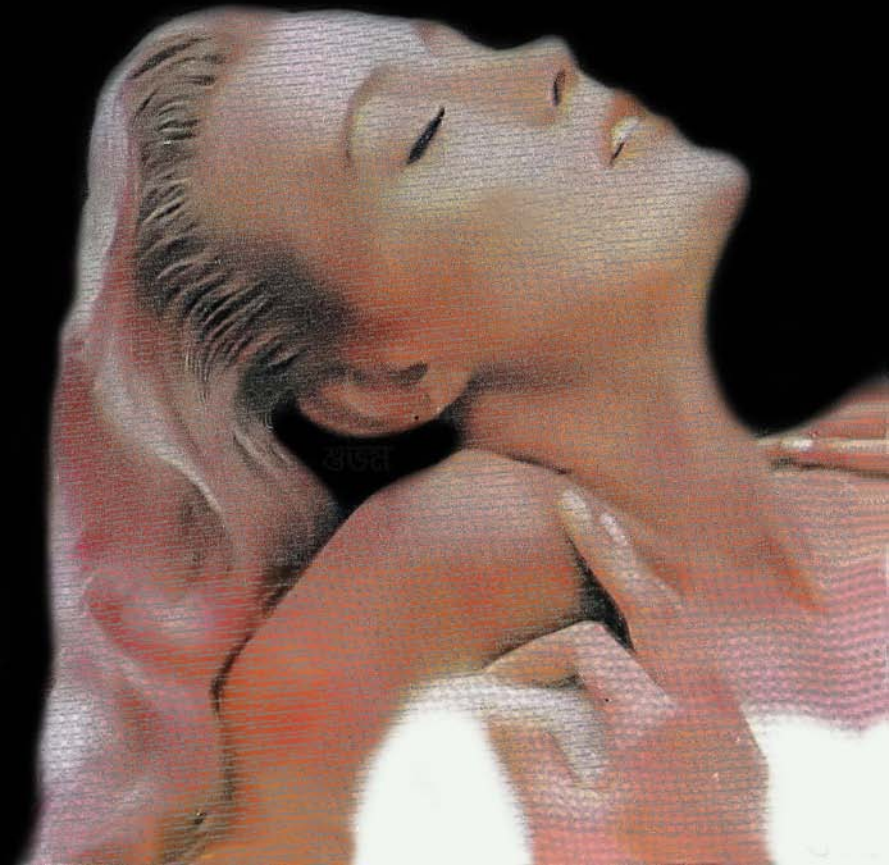

প্রাপ্তবয়স্কদের রোমাঞ্চোপন্যাস

মধ্যরাতের অভিসার

সুমন চৌধুরী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঝড় তুললো এক অসামান্যা সুন্দরী হেলেন পেইস। ঝড় পুরুষ মানুষের দেহে এবং সমাজ জীবনে।

একটার পর একটা রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যেতে লাগলো।

প্রতিশোধ স্পৃহা এবং জৈবিক বাসনা চরিতার্থ করার ভয়াল এক কাহিনী, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

কাজী পাবলিশার্স
২২, এলিফ্যান্ট রোড,
ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ।

মধ্যরাতের অভিসার

প্রাপ্তবয়স্ক রোমাঞ্চোপন্যাস

সুমন চৌধুরী

প্রকাশক ঃ
কাজী একরামুল হক
কাজী পাবলিশার্স
ভি/এ/২, রাজিয়া সুলতানা রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ই
রচনা ঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রচ্ছদ ঃ পঙ্কজ পাটক

মুদ্রণে ঃ
ওয়াল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশিং
১৪২, আরামবাগ
ঢাকা—১০০০

যোগাযোগ ঃ
কাজী পাবলিশার্স
ভি/এ/২, রাজিয়া সুলতানা রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

MADHYARATER AVISHAR
SUMON CHOWDHURY

মধ্যরাতের অভিসার

সুমন চৌধুরী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার
সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ।। লেখক ।।

এক

এথেন্স ঃ ১৯৪৭ পুলিশ চীফ জজিয়স স্কুরি দেখেছিলো, এথেন্স নগরীর শহরতলীর অফিসবাড়ি এবং হোটেলগুলো যেন একের পর এক ভেঙে নিঃশব্দে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

'কুড়ি মিনিট লাগবে,' ষ্টিয়ারিং হুইলে মোচড় দিয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত ড্রাইভার আশ্বাস দেয়। 'ট্রাফিকের ভীড় নেই।'

স্কুরি আনমনে ঘাড় নাড়ে। সে বাড়িগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। বাড়িগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, এই দৃষ্টিবিভ্রম তাকে সম্মোহিত করে রাখে। আগষ্ট মাসের প্রখর সূর্য কিরণে মনে হচ্ছে যেন ঝিকিমিকি সূর্য তরঙ্গগুলো স্বচ্ছ ঝর্ণাধারায় এখনই লুটিয়ে পড়বে পথের বুকে।

দুপুর বারোটা বেজে দশমিনিট। রাস্তাঘাট প্রায় জনমানব শূন্য। পথে যে দুই চারজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে তাদের কারোই এথেন্সের বিমানবন্দরের দিকে ধাবমান তিনখানি পুলিশ গাড়ির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন রকম উৎসাহ নেই। প্রথম গাড়ীতে বসে রয়েছে চীফ অফ পুলিশ জজিয়স স্কুরি। এরকম সময় স্কুরি সাধারণত তার বিলাসবহুল অফিস ঘরের আরাম কেদারায় বসে থাকে। আর তার অধঃস্তন কর্মচারীরা

প্রখর উত্তাপে ছুটোছুটি করে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে থাকে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক নয় বলেই স্কুরিকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে সশরীরে। এর অবশ্য দুটো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ : আজ সারাদিন ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ভি, আই, পি-রা আসবে এথেন্সে। বিমান বন্দরে যাতে কাষ্টমস বিভাগ তাদের সঙ্গে কোন রকম ঝামেলা না করে এবং তারা যেন যথাযথ সম্বর্ধনা পায় সেটা দেখা দরকার। দ্বিতীয় কারণটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজ বিমান বন্দরে বিদেশী সংবাদপত্রের সাংবাদিক, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র আলোকচিত্র শিল্পীদের ভীড় থাকবে। চীফ অফ পুলিশ নির্বোধ নয়। সকালে দাড়ি কামাতে কামাতে সে ভেবেছে, টি, ভি সংবাদে অতিথিদের সংবর্ধনা জানানোর সময় ওকেও দেখা গেলে তার ভবিষ্যত পদোন্নতির রাস্তা সুগম হবে। নিয়তির অদ্ভুত খেয়ালে সারা বিশ্বকে চমকে দেবার মত একটা ঘটনা ঘটেছে তার এলাকায় এবং সেই সুযোগ কাজে না লাগানো তার পক্ষে বিরাট বোকামী হবে। এ ধরনের সুযোগ সচরাচর আসে না এবং এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারলে আখেরে ফল দেবে। এমনকি ঈশ্বরের করুণায় জর্জিয়সের মাইনে তো বাড়বেই এবং বর্তমান পুলিশ কমিশনারের অবসর বা মৃত্যুর পর সে পুলিশ কমিশনারের পদে উন্নীত হবে।

বিমান বন্দরে যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় সে জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মিঃ স্কুরি এক ডজন লোক সঙ্গে এনেছে। এরা সবাই দক্ষ পুলিশ। জর্জিয়সের প্রধান সমস্যা হলো সাংবাদিকদের নিয়ে। পৃথিবীর সব কটি নামী সংবাদপত্রের জাঁদরেল সাংবাদিক আজ এথেন্সে উপস্থিত। এরই মধ্যে স্কুরিকে ছ'বার সাংবাদিকদের মুখোমুখি বসে

সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে এবং সেই সব সাক্ষাৎকার ছ'ছটি ইংরাজী ফারসী, ইতালিয়ান, জাপানী, জার্মান এবং রুশ ভাষায় বিশেষ প্রতিবেদন হিসেবে ছাপা হয়েছে। খুশীতে ডগোমগো হয়ে উঠেছিলো স্কুরি। কিন্তু ঝামেলা পাকালেন পুলিশ কমিশনার। পুলিশ কমিশনার তাকে ফোনে জানালেন, মার্ডার ট্রায়াল এখনও শুরু হয়নি, অতএব সে সম্পর্কে চীফ অফ পুলিশের সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি দেওয়া উচিত নয়। কমিশনারের ফোন পেয়ে জজিয়স ভাবল, আর এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েই তিনি এরকম মন্তব্য করছেন। তবুও উপরওয়ালার আদেশ অমান্য না করে এবং সাবধানের মার নেই ভেবে মুখে কুলুপ এঁটে চুপচাপ রইল জজিয়স। অতঃপর প্রেসের লোকজনের কাছে তার কোন সাক্ষাৎকার দিল না স্কুরি।

কিন্তু আজ এথেন্স বিমান বন্দরে ভি, আই, পি-দের ফটো তোলার সময় জজিয়সের চেহারাও দেখা গেলে কোন অভিযোগ জানাতে পারবেন না পুলিশ কমিশনার।

সিগ্‌ এভিনিউ দিয়ে ছুটে চলেছে পুলিশের গাড়ী। উত্তেজনায় পেটের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিমান বন্দর। জজিয়স মনে মনে একবার ভেবে নেয় সেই সব ভি, আই, পি-দের নামের তালিকা—যারা আজ এথেন্সে আসছে···

বিমানে চড়তে ভয় পায় ফ্রাঁসোয়া গদার। গদার একজন বিশ্ববিখ্যাত চিত্র ও নাট্য পরিচালক। নিজেকে এবং নিজের জীবনকে বড্ড বেশী ভালবাসেন তিনি। গদারের চেহারার মধ্যে পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। দীর্ঘকায় রোগা উঁচু কপাল মুখ ভঙ্গিতে সর্বদা বিদ্রূপের ভাব। ফরাসী

চলচ্চিত্র জগতে নবতরঙ্গের ঢেউ শুরু হলে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে গদার আন্দোলনের পুরোধায় আত্ম-প্রকাশ করেন। ওই আন্দোলনের পথিকৃৎও বলা চলে তাকে। পরে সার্থক নাট্য পরিচালক রূপে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এই সাফল্য আরও বেশী চমকপ্রদ। বর্তমানে বিশ্বের প্রথম সারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য ও চিত্র পরিচালকরূপে স্বীকৃত। আজ বিমান যাত্রার শেষ কুড়ি মিনিটের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়টা তার দারুণ কেটেছে। বিমান সেবিকারা তাকে চিনতে পেরে একটু বেশীমাত্রায় আদর যত্ন করেছে এবং আকার ইঙ্গিতে তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। অনেক সহযাত্রী এসে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে এই বিখ্যাত নাট্য ও চিত্র পরিচালককে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সুন্দরী তরুণী ছাত্রী জানালো, সে আধুনিক নাটক এবং নাট্যধারার বিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করে থিসিস লিখছে। বিশেষ করে গদারের নাটকগুলিই তার থিসিসের প্রধান উপজীব্য। আলোচনা আরও জমে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠলো, আপনি তো হেলেন পেইস-এর পরিচালক ছিলেন। হেলেন এখন খুনের মামলার আসামী। ওর সম্পর্কে কিছু জানাবেন ?

সীটের হাতল শক্ত করে চেপে ধরেন গদার। একটু আড়ষ্ট হয়ে ওঠেন। আজ এত বছর পরেও হেলেনের স্মৃতি তাকে তীব্র এক যন্ত্রণা দেয়। অন্য কোন নারী কোনদিন তাকে এভাবে স্পর্শ করতে পারেনি এবং কোনদিন কেউ পারবেও না। মাত্র তিন মাস আগে খুনের মামলার আসামী হয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে নাট্য ও চিত্রজগতের জনপ্রিয় নায়িকা হেলেন পেইস। খবরটা শোনার পর থেকে কোন কিছু ভাবতেই পারছেন না গদার। চিঠি এবং টেলিগ্রাম করে ওকে জানিয়েছে যে, সব রকমের সাহায্য

করতে প্রস্তুত তিনি। কিন্তু কোন জবাব দেয়নি হেলেন। ওর বিচারের সময় উপস্থিত থাকার কোনো ইচ্ছে ছিল না তার। তবুও না এসে পারা যায়নি। হেলেন যে তাঁর প্রেমিকা! অনেকদিন একসঙ্গে তারা বাস করেছে। আজ কী ও বদলে গেছে? নিজের চোখে একবার দেখতে চান হেলেনকে। এছাড়া আরও একটা কারণ আছে। সেটা হলো তার সূক্ষ্ম মন, যে মন নাটক ভালবাসে। তরুণীর জবাব আর দেয়া হলো না। ইন্টারকমে ভেসে আসে পাইলটের গম্ভীর ঘোষণা।

'আর তিন মিনিট পরেই এথেন্সের বিমান বন্দরে বিমান অবতরণ করবে।'

কেপটাউন থেকে এথেন্সে আসছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিউরো-সার্জন ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ। ওখানকার হাসপাতালে তিনি রেসিডেন্ট নিউরোসার্জন। মেডিক্যাল জার্নালে তাঁর বহু নতুন নতুন গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য ছাপা হয়। রোগীদের মধ্যে কোন কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিও রয়েছেন। মাঝারি উচ্চতা, মুখমণ্ডলে বুদ্ধির ছাপ, বাদামী রঙের গভীর দুটো চোখ, একটু লম্বা দুখানি হাত। বি, ও, এ, সি'র সীটে গা এগিয়ে বসলেন ডঃ কাৎজ। তাঁকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ক্লান্ত হলেই ডান উরুতে ব্যথা হয়। হাঁটুর নিচ থেকে তাঁর ডান পাটা নেই। বছর ছয়েক পূর্বে দৈত্যকায় এক মানুষ কুড়ুলের এক কোপে ডঃ কাৎজের ডান পাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। হাসপাতালের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের মিটিং অসমাপ্ত রেখেই এথেন্সের বিমান ধরেছেন কাৎজ। খুনের মামলার আসামী হেলেন পেইস এর বিচার হবে আজ এথেন্সে। সেই বিচার দেখতে চলেছেন ইজরায়েল কাৎজ। স্ত্রী এসথার মানা করেছিল যেতে। বলেছিলো, 'ইজরায়েল, ওর জন্যে এখন আর কিছুই করতে পারবে না।'

হয়তো ঠিকই বলেছে এসথার। এখন আর হেলেনের জন্যে তার করার কিছুই নেই। তবুও একথা সত্যি একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে আজকের খুনের মামলার আসামী হেলেনই ডক্টর ইজরায়েলের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সেই ঋণ আজও শোধ করতে পারেননি ডক্টর।

এই মুহূর্তে শুধু হেলেনের কথাই ভাবছেন ডক্টর। একটা অনুভূতি তাঁর মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে চলেছে। অনুভূতি বর্ণনার অতীত। আজও সেই অনুভূতি মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি দেয়। স্মৃতির অতলে ভেসে বেড়ান ডক্টর কাৎজ···

বিমান কাঁপছে। সম্ভবত এখনই কায়রো বিমান বন্দরে অবতরণ করবে বিমান। কায়রো থেকে আবার যাত্রা শুরু হবে এথেন্সের উদ্দেশ্যে।

এথেন্সে আজ বিচার হবে হেলেন পেইস-এর। আচ্ছা, মেয়েটা কী সত্যিই দোষী? সে কী সত্যিই খুন করেছে? প্যারিসের এক বীভৎস ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় ইজরায়েলের

প্রমোদতরীর রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে জনপ্রিয় ফরাসী চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা ফিলিপ সোরেল দেখছে, পিরিয়াস বন্দর এগিয়ে আসছে কাছে। ফিলিপ সমুদ্র যাত্রাই বেশী পছন্দ করে। কেননা এর ফলে ফ্যানদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বক্স অফিসের মানদণ্ডে সোরেল বিশ্বের অন্যতম সেরা চিত্র নায়ক। অথচ ফিল্ম জগতে ঢোকার মত কোন চেহারাই তার নেই। হেভীওয়েট বক্সিংয়ে হেরে যাওয়া বক্সারের মত তার মুখ। সারা মুখ এবড়ো থেবড়ো। নাকটা ভাঙা, মাথার চুল পাতলা। এক কথায় সিনেমার হীরো হবার মত কোন সৌন্দর্যই তার নেই। কিন্তু সোরেলের চেহারার মধ্যে প্রচণ্ড পৌরুষ রয়েছে? সে শিক্ষিত ও নম্র স্বভাবের

মানুষ। সেক্স অ্যাপীল থাকার জন্যে তার উপস্থিতি মেয়েদের মনে যৌন কামনা জাগায়। কিন্তু পুরুষ দর্শকেরাও তাকে সমানভাবে পছন্দ করে।

শুটিং বন্ধ রেখে ফিলিপ খুনের মামলার আসামী হেলেন পেইসের বিচার দেখার জন্যে এথেন্সে চলেছে। সে জানে যে দিনের পর দিন কোর্টরুমে বসে বিচার শুনতে শুনতে সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের সহজ শিকার হতে হবে তাকে। সঙ্গে প্রেস এজেন্ট ও পার্সোনাল সেক্রেটারী না থাকায় তাকে বেশ অসুবিধেয়ও পড়তে হবে। এই ট্রায়ালে তার উপস্থিতির কারণটা সঠিক বুঝবে না সাংবাদিকরা। ওরা সবটাই ভুল বিবেচনা করবে। ওরা ভাববে, প্রাক্তন রক্ষিতার বিচারে উপস্থিত থেকে নিজের সহজ প্রচার চালাতে চাইছে ফিলিপ। সবদিক থেকে যে অভিজ্ঞতাটা তার পক্ষে বেদনাদায়ক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু হেলেনের সঙ্গে একবার তাকে দেখা করতেই হবে। চেষ্টা করে দেখতে হবে যদি সে কোনভাবে যাহায্য করা যায় ওকে।

মনে মনে ফিলিপ স্মৃতি রোমন্থন করে হেলেনকে সে এক সময় খুব ভালবাসত, ওর সঙ্গে একান্তে বহু রাত কাটিয়েছে। একটা কথা ভাবে ফিলিপ, হ্যাঁ, হেলেনের পক্ষে খুন করা বা খুনের সহায়তা করা অসম্ভব কিছুই নয়

হেলেনিকন বিমান বন্দরের একশো এয়ার মাইল উত্তর পশ্চিমে উড়ছে প্যান আমেরিকান-এর ক্লিপার। সেই বিমানের মধ্যে ভি, আই, পি সীটে বসে হাতের ব্রীফ কেসটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী উইলিয়ম ফ্রেজার। ফ্রেজারের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, সুদর্শন সুপুরুষ। চুলের ধূসর মুখভাব কঠোর এবং ভাব ভঙ্গিতে কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। মার্কিন কংগ্রেসে এখন ঝামেলা

চলেছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাকে ছুটি নিতে হলো। পরবর্তী কয়েকটা সপ্তাহ তার কাছে খুবই যন্ত্রাণাদায়ক হবে। কিন্তু কোন উপায় নেই। সে খুনের বিচার দেখতে নয়, প্রতিশোধ নিতে চলেছে। এই এই প্রতিশোধ স্পৃহার ভাবনা তাকে এক অদ্ভুদ সন্তুষ্টি দিচ্ছে। কাল সকালে হেলেনের বিচার শুরু হবে। বিমানের জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পায় একটা এক্সকারশন বোট সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে গ্রীসের দিকে চলেছে···

মার্সেই বন্দরে এক্সকারশন বোটে চড়েছে অগাস্তে লাশ। ঝড়ের মুখে পড়েছিল বোট। তিনদিন ধরে তার অনবরত বমি হয়েছে। তার বউ যদি তার উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারে তা হলে সর্বনাশ। বয়স ষাটের কোঠায়, মোটাসোটা, টাকমাথা। পা দুটো ছোট এবং ভারী মুখে বসন্তের দাগ চোখদুটো কুতকুতে। পাতলা ঠোট জোড়ার ফাঁকে সবসময় সস্তা দামের চুরুট ঝুলে থাকে। মার্সেই শহরের একটি পোশাকের দোকানের মালিক সে। বউকে বোঝায়, ধনীলোকদের মত দেশবিদেশ বেড়াতে যাবার মত টাকাকড়ি তার নেই। অবশ্য সে ঠিক বেড়াতে যাচ্ছে না। তার প্রেয়সী হেলেন পেইসকে একবার দেখতে যাচ্ছে। অনেক বছর আগে তাকে ছেড়ে চলে গেছে তার প্রেমিকা। তারপর থেকেই নানা সংবাদপত্র ও খবর পড়ছে অগাস্তে। প্যারীতে প্রথম যখন নাটকে নায়িকার ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণা হলো হেলেন, সেই নাটক দেখার জন্যে ট্রেনে করে সে প্যারী গিয়েছিল। কিন্তু হেলেনের বোকা সেক্রেটারীরা তাকে তার সঙ্গে দেখা করতে দিল না। পরে হেলেন যখন চলচ্চিত্রে নামলো সেই ছবি সে বার বার দেখেছে। দেখেছে আর ভেবেছে সেই সব রাতের কথা, যে সব

রাতে হেলেন তার শয্যাসঙ্গিনী ছিল। এ কথা ঠিক, এথেন্সে যেতে তার খরচ হবে। কিন্তু হেলেনের সঙ্গে তো দেখা হবে। হেলেনরও হয়তো মনে পড়বে সেইসব স্বপ্নময় রঙীন দিনগুলোর কথা তখন হেলেন অগাস্তের সঙ্গে ছিল। হেলেন হয়তো তার সাহায্য চাইবে। সাধ্যের মধ্যে হলে সে সাহায্যও করবে। তাহলে হেলেন ছাড়া পাবে। এরপর হেলেনকে নিয়ে মার্সেই শহরের ছোট একটা ফ্ল্যাটে রাখবে অগাস্তে। তবে যা কিছুই করুক অগাস্তে, সবই বউকে লুকিয়ে করতে হবে। বউ যেন কিছু জানতে না পারে···

এথেন্স শহরের দরিদ্রপল্লী 'মোনাস্তিরাকি' এলাকায় পুরানো ভাঙ্গা-চোরা একটা বাড়ীতে দোতলার ছোট্ট চেম্বারে বসে ব্যস্ত উকিল ফ্রেডরিক স্টাভরস। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই উকিলের বয়স খুবই কম। ফ্রেডরিক মনে মনে ভাবছে,এই কেসটা জিততে পারলে তার ভাগ্যের দরজা খুলে যাবে। সে বহু ব্রীফ পাবে, প্রেমিকা এলেনাকে বিয়ে করে সুখী সংসার পাতবে। নতুন বাড়ীতে একটা বড় অফিস খুলে বসবে। বড় বড় মক্কেলরা তার অফিসে ধর্ণা দেবে তাকে ব্রীফ দেবার জন্যে। অবশ্য, তার ভাগ্যের পট-পরিবর্তন এখনই শুরু হয়ে গেছে। শহরের রাস্তায় বেরুলে এখন অনেকেই তাকে চিনতে পারে। সে অনেককেই বলতে শোনে; এই সেই উকিল ফ্রেডরিক যে ল্যারী ডগলাসের পক্ষ সমর্থন করবে। এই মার্ডার কেসের দুজন আসামী, ল্যারী ডগলাস এবং তার প্রেমিকা রূপসী হেলেন পেইস। হেলেনের গ্ল্যামার আছে, কিন্তু ল্যারীর নেই। ফ্রেডরিক ভাবে, হেলেনের পক্ষ সমর্থন করতে পারলে অনেক বেশী নাম হতো তার। যাকগে, শতাব্দীর সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ খুনের মামলায় সে যে একটা ভূমিকা পেয়েছে, এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট। যদি দুজন আসামীই বেকসুর খালাস

হয়, তাহলে দুই উকিলেরই খুব নামডাক হবে। আচ্ছা যদি এমন হয়, ভাবে ফ্রেডরিক, হেলেন খুনের দায় থেকে মুক্তি পায় আর তার আসামীর প্রাণদণ্ড হয়? এ ধরনের পরিণতির কথা ভাবলেই ভয়ে কেঁপে ওঠে ফ্রেডরিক।

হেলেন পেইসের পক্ষ সমর্থন করেছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিমিনাল লইয়ার নেপোলিয়ঁ শটাস। নেপোলিয়ঁ আজ পর্যন্ত এই ধরনের মামলায় হারেননি। কেউ জানে না এই কেসে নেপোলিয়ঁর প্রতিভার সাহায্যে নিজের মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করার প্ল্যান এঁটেছে ফ্রেডরিক। এই সব কথা ভাবে আর নিজের মনেই হাসে ফ্রেডরিক...

এথেন্স শহরের অভিজাত্য পল্লী 'কলোনাকি'র একজন বড়লোকের বাড়িতে ডিনার খাচ্ছেন নেপোলিয়ঁ শটাস। রোগা সুখে বড় বড় বিষণ্ণ চোখদুটো ব্লাডহাউণ্ডের চোখের মত দেখায়। তবে তাঁর ব্যবহার খুবই অমায়িক তারই আড়ালে লুকিয়ে অসাধারণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি।

কাল সকালে হেলেনের বিচার শুরু হবে, নেপোলিয়ঁ ভাবছেন।

কেউ কেউ নেপোলিয়ঁকে জিজ্ঞেস করে, 'হেলেন পেইস কী ধরনের মেয়ে?'

'অসাধারণ রূপসী এবং প্রতিভাময়ী

হঠাৎ থেমে যান নেপোলিয়ঁ। কথায় বোঝানো যাবেনা হেলেন কী ধরনের মেয়ে। প্রথম আর দশজন অভিনেত্রীর মত সিনেমার পত্র পত্রিকায় শরীর সর্বস্ব ছবি আর গসিপ পড়ে ওর সম্পর্কে খুব বাজে ধারণা হয়েছিলো নেপোলিয়ঁর। মনে হয়েছিল, হেলেনের শরীর আছে কিন্তু মস্তিষ্ক নেই। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল। হেলেনকে দেখে ভাল-বেসে ফেলেছেন নেপোলিয়ঁ।

সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। হেলিকপ্টার বা প্রমোদতরী ছাড়া ওখানে যাওয়া যায় না। বিমান ক্ষেত্র ও বন্দর চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেয় সশস্ত্র প্রহরী আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর। এই দ্বীপের মালিক কোটি পতি কনস্ট্যানটাইন ডেমিরিস। বিনা আমন্ত্রণে ওখানে যাওয়া যায় না। প্রতি বছর এই দ্বীপে আসেন রাজা-রানী, রাষ্ট্রপ্রতি, ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি, ফিল্ম স্টাররা, অপেরা গায়ক, শিল্পী এবং বিখ্যাত লেখকরা। এখানকার আন্তরিক আতিথেয়তায় সবাই খুশি হয়। পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় ডেমিরিসের স্থান তৃতীয়। অর্থের বিনিময়ে কিভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হয় তা ডেমিরিস জানে।

লাইব্রেরীর আর্মচেয়ারে বসে স্পেশাল ব্রেণ্ডের ইজিপসিয়ান সিগারেট টানছেন কনস্ট্যানটাইন। কাল সকালে তার ভূতপূর্ব প্রেয়সী হেলেন পেইনের বিচার। সংবাদপত্রের লোকজন তার সঙ্গে দেখা করবার বৃথা চেষ্টা করেছে। তাঁর প্রেমিকা খুনের মামলার আসামী। পরোক্ষ তাঁর নাম এই মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

এই মুহূর্তে নিকোডেমাস খ্রিটে জেলখানার সেলে বসে খুনের মামলার আসামী হেলেন কী ভাবছে? ও কী এখন ঘুমিয়ে পড়েছে? না কী বিচারের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছে?

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিমিনাল ল'ইয়ার নেপোলিয়ঁ শটাস হেলেনের পক্ষ সমর্থন করবেন। নেপোলিয়ঁর ওপর আস্থা রাখা যায়। মেয়েটা দোষী না নির্দোষ, সেটা বড় কথা নয়। ওর পক্ষ সমর্থনের জন্যে নেপোলিয়ঁকে অবিশ্বাস্য অংকের ফী দিয়েছে কোটিপতি কনস্ট্যানটাইন। সেই অংক আর বিশ্বাসের মূল্য ফেরৎ দিতে হবে নেপোলিয়ঁকে। বিচার ঠিকই চলবে। তার জন্যে চিন্তার কিছু নেই।

দুই

শিকাগো : (১৯১৯-১৯৩৯) প্রত্যেক বড় শহরেরই বিশেষত্ব থাকে। থাকে এক স্বতন্ত্র প্রতিবিম্ব। ১৯২০-এর শিকাগো শহর চঞ্চল এবং দুর্দম গতিশীল এক দানব অতীতের নির্মম নিষ্ঠুর এই নগরীর জন্ম দিয়েছিলেন উইলিয়ম বি, ওগডেন, সাইরাস ম্যাককরমিক এবং জর্জ এম, পুলম্যান। এটা ফিলিপস আরমর, গুস্তাভাস স্যুইফটস্ এবং মার্শাল ফিল্ডসের রাজ্য। পেশাদার এই গ্যাংষ্টারদের রাজ্যের নেতা হাইমি ওয়েস এবং আল কাপোন।

ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডারের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাকে বারে নিয়ে গিয়ে তার বাবা নিজের জন্যে বড় এক গ্লাস বীয়ার এবং মেয়ের জন্যে 'গ্রীন রিভার' নামের এক কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিয়েছিলেন। ছোট্ট সুন্দর মেয়েকে দেখে প্রশংসা করে আদর করেছে বাবার বন্ধুরা। ওদের বিল মেটাচ্ছে তার বাবা। তার বাবা ট্রাভেলিং সেলসম্যান। কাল রাতে ফিরেছে। আবার চলে যাবে। বাবা বলছে চাকরীর প্রয়োজনে দূর দূর শহরে যেতে হয়। মাসের পর মাস বাইরে থাকতে হয়। নইলে মেয়ের জন্যে সুন্দর সুন্দর উপহার আনবে কী করে? কিন্তু, ক্যাথরিন তার বাবাকে কাছে পেতে চায়, উপহার চায় না।

বাবা ওর কথায় হাসে। তারপর আবার বাড়ি ছেড়ে দূরে পাড়ি জমায়। জীবনের প্রথম বছরগুলোতে মাকে সব সময় কাছে পেলেও

তার মনে হয়েছে মা অনির্দেশ অবয়বহীন এক ব্যক্তিত্ব। বাবা কচিৎ কখনো এসেও চমকপ্রদ, হাসিখুশী, সুন্দর, মজার মজার কথা বলেন, বেড়াতে নিয়ে যান, ভাল ভাল উপহার এনে চমকে দেন।

ক্যাথরিনের সাত বছর বয়সের সময় ওর বাবার চাকরী গেল। ওদের জীবন যাত্রার হালচালও বদলে গেল। শিকাগো ছেড়ে ওরা গেল ইন-ডিয়ানা নগরীতে, সেখানে জুয়েলারীর দোকানে চাকরী নিল ওর বাবা। ক্যাথরিন এই প্রথম স্কুলে ভর্তি হলো। স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েদের থেকে সে দূরে থাকতো। মাষ্টারদের সে ভয় করতো। শিক্ষক শিক্ষিকারা ভাবতো, মেয়েটা অহংকারী। এখন রোজ রাতে ডিনার খেতে বাড়ি আসে তার বাবা এবং এই প্রথম ক্যাথরিনের মনে হয়, তাদের পরিবারও অন্য সব পরিবারের মত স্বাভাবিক। কিন্তু দুমাস পরেই আবার চাকরীটা খোয়ালো ওর বাবা। এবার গেল শিকাগোর উপকণ্ঠে, হারভে শহরে। এখানে বছরের মাঝখানে স্কুলে ভর্তি হলো ক্যাথরিন। অন্য মেয়েদের মধ্যে তার আগেই ভাব জমে গেছে। ক্যাথরিন একা থাকে। অন্য মেয়েরা দল বেঁধে তাকে হাসি ঠাট্টা করলে সে উদাসীন ভাব দেখায় এবং দরকার হলে স্বল্প কথায় তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে। উদ্দেশ্য ছিল, যারা পেছনে লেগেছে, তাদের হটানো। কিন্তু ফল হলো অন্যরকম। ওর ক্লাসমেটরা গানবাজনার একটা আসর বসিয়েছিল। মিস্ট্রেস বললেন, সেই অনুষ্ঠানের কথা লিখতে। এবং ক্যাথরিন লিখলো: 'টমি বেলডেন একা ট্রামপেট বাজারে বলেছিল। কিন্তু সে ট্রামপেট ফাটালো'। সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল কথাটা এবং সব চেয়ে অবাক কাণ্ড, পরের দিন সহপাঠি টমি বেলডেন ক্যাথরিনকে বললো: মজাটা সে উপভোগ করেছে। ইংরেজীর ক্লাসে পড়ানো হলো ক্যাপটেন হোরেশিও হর্ণব্লোয়ার। ওটা

পড়তে একদম ভালো লাগেনি ক্যাথরিনের। পরীক্ষায় সে ওটার সম্বন্ধে একটা মাত্র লাইন লিখলো—'উনি যতো গর্জান ততো বর্ষাণ না।' ওর শিক্ষকের সখ হলো ছুটিতে সমুদ্রে নৌকো ভাসানো। তিনি ক্যাথরিনকে পরীক্ষায় 'এ' গ্রেড দিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, রসবোধের জন্য স্কুলের নামডাক হয়েছে ক্যাথরিনের এবং তার মন্তব্যগুলো সহপাঠিদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে।

চোদ্দয় পড়লো ক্যাথরিন। তার শরীরে যৌবনের চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নায় নিজেকে দেখে ক্যাথরিন। সে ফিল্ম-ষ্টারদের মত সুন্দরী হতে চায়। অথচ আয়নাটা তার শত্রু। আয়না দেখায়-বিশ্রীভাবে জটপাকানো কালো চুল, যা কিছুতেই সামলানো যায় না। গম্ভীর ও ধূসর দুটো চোখ, মুখের হাঁ যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বড় হচ্ছে এবং ন্যাকটা একটু বাঁকা। হয়তো সে কুৎসিত নয়, কিন্তু সুন্দরী হয়ে অজস্র পুরুষকে রূপের নেশায় পাগল করে দেওয়া কী এই চেহারায় সম্ভব? গাল টেনে, চোখে সেক্সি ভাব এনে নিজেকে সুন্দরী মডেলের ভূমিকায় দেখতে চেষ্টা করে ক্যাথরিন। তাতে লাভ হয়না, শুধু হতাশা বাড়ে। চোখ বড় বড় করে, মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে অন্য একটা পোজেও দেখায় না তাকে। তার শরীর অন্য মেয়েদের মত। অথচ বিশেষ কিছু, বিশেষ কেউ হতে চায় ক্যাথরিন। যাকে সবাই মনে রাখবে। যে কোনদিন মরবেনা।

সে বছর গ্রীষ্মে ক্যাথরিনের বয়স হলো পনেরো। মেরী বেকার এডি সম্পাদিত 'সায়েন্স অ্যাণ্ড হেলথ' পত্রিকাটা তার হাতে এলো। আয়নার সামনে দিনে এখন একঘণ্টা কাটায় ক্যাথরিন। তার আশা সুন্দরী হবে। দুহপ্তা পরে দেখা গেল; বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, শুধু কপালে একটা

রন, চোয়ালে আর একটা। মিষ্টি খাওয়া, সায়েন্স অ্যাণ্ড হেলথ ম্যাগাজিন পড়া এবং আয়নায় নিজেকে দেখার অভ্যাসটা ছাড়লো ক্যাথরিন। আবার শিকাগো। এবার শহরের উত্তরে জোসারস পারকের একটা কম ভাড়ার ছোট্ট ও বিশ্রী ফ্ল্যাটে উঠলো ওদের পরিবার। আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যুগ চলেছে। ক্যাথরিনের বাবা কাজ করে কম, মদ খায় বেশী। বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়া লেগেই থাকে বলে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায় ক্যাথরিন।

আমেরিকান ঔপন্যাসিক টমাস উলফ-এর উপন্যাস পড়েছে ক্যাথরিন। টমাস উলফ-এর উপন্যাসের মূল সুর নষ্টালজিয়ার। তারই তিক্তমধুর প্রতিচ্ছবি যেন নিজের মধ্যে দেখতে পায় ক্যাথরিন। অনাগত এক ভবিষ্যতের জন্যে প্রতীক্ষা, যখন আশ্চার্য সুন্দর এক জীবন পাবে ক্যাথরিন। এখন তার শরীরে যৌবন আসছে। কিন্তু সে জানে যে তার এইসব কামনা বাসনার সঙ্গে সেক্সের কোন সম্বন্ধ নেই। সে চায়, সবাই তাকে চিনুক, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের থেকে সে স্বতন্ত্র হবে, যারা তাকে চেনে তারা বলবে, 'এই ক্যাথারিন আলেকজাণ্ডার, বিখ্যাত—'

বিখ্যাত কী? ওটাই তো সমস্যা। সে কী যে চায়, সে নিজেই জানেনা। পকেটে পয়সা থাকলে শনিবার বিকেলে সে থিয়েটারে যায় নয়তো সিনেমা দেখে। এক আশ্চার্য পরিশীলিত জগতের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ক্যাথরিন। নিজের মায়ের চেয়ে ফিল্মের আইরিন ডানকে কাছের মানুষ মনে হয় ক্যাথরিনের।

লেন হাই স্কুলে তার শেষ বছর ঘনিয়ে এলো। এখন আয়না আর শত্রু নয়, বন্ধু। আয়নায় প্রাণশক্তিতে ভরপুর ও আকর্ষণীয় এক রমণীর

ওয়েটারকে বেশ কিছু টিপস দিলো। দুহাতে খরচ করে বলে যার নাম, তাকে সেই নামটা বজায় রাখতে হবেতো। এসব জেনেও এই মানুষটাকে ভালোবাসে ক্যাথরিন। তার উৎসাহ, তার হাসি গম্ভীর এবং ভুরু কোঁচকানো পুরুষদের ভীড়ে যেন ভালো লাগে।

এপ্রিল মাসে হার্টের অসুখে মারা গেল ক্যাথরিনের মা। মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হলো ক্যাথরিন। তাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটে বন্ধু ও আত্মীয়েরা আসে সহানুভূতি জানায়। ফিসফিস করে ভালো কথা বলে শোকের সময় যেমনটি বলতে হয়।

মাকে করব দেওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওমাহা থেকে প্লেনে এলো ক্যাথরিনের কাকা র‍্যালফ ও কাকীমা পলিন। কাকার বয়স বাবার থেকে দশ বছর কম। কাকা অন্যরকম মানুষ। ব্যবসায় অনেক টাকা কামিয়েছে কাকা। শক্ত, লম্বা চওড়া, চৌকোণা শরীর, কাঁধ, চোয়াল এবং মনটাও একই রকম। তার বউ পলিন পাখীর মত কিচমিচ করে, ডানা ঝাপটায়। ভালো মানুষ ওরা। দাদাকে আগে অনেক টাকা ধার দিয়েছে র‍্যালফ, কিন্তু ক্যাথরিন জানে, ওদের সঙ্গে তার মনের মিল হবেনা। ওরা স্বভাবে ক্যাথরিনের মায়ের মত। ওরা স্বপ্ন দেখতে জানেনা।

র‍্যালফ দাদাকে বলে, আমি জানি, তোমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তুমি বড্ড বেশী স্বপ্ন দেখো। তবু তুমি আমার দাদা। তুমি ডুবে যাবে আমি দেখবো, তা হয় না। তোমরা ওমাহায় এসো। তুমি আমার ব্যবসায় কাজ করবে। নিয়মিত আয় হবে। তুমি ও ক্যাথরিন আমাদের বাড়িতে থাকবে।

ভেবে দেখি, বললো ক্যাথরিনের বাবা।

দু'টার ট্রেনে ফিরে যাবো আমি আর পলিন। তার আগে ভেবে বোলো, কী করবে!

ও চলে যেতে বাবা ক্যাথরিনকে বলে, ওমাহা! ওখানে হয়তো ভালো একটা সেলুনও নেই।

কিন্তু, ক্যাথরিন জানে স্রেফ তাকে শোনাবার জন্যে নাটক করছে তার বাবা। ওমাহায় ভালো সেলুন থাকুক আর না থাকুক, ওর বাবার ওখানে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। স্বপ্নের শেষ। জীবন ক্যাথরিনকে ফাঁদে ফেলেছে। তার বাবাকেও। বাবা এখন কাজ করবে নিয়মিত অফিসে যাবে। বনের পাখী খাঁচায় ঢুকলে যেমন ডানা ঝাপটায় তেমনি কষ্ট পাবে। ক্যাথরিনের নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির স্বপ্নও শেষ। সে স্কলারশিপের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছে। কোন উত্তর আসেনি। সেদিন বিকেলে তার বাবা ফোন করে কাকাকে জানালো, ওমাহা যেতে রাজি।

পরের দিন সকালে ক্যাথরিন প্রিন্সিপালকে বললো, সে ওমাহা স্কুলে ট্যান্সফার চায়। কিন্তু, উনি বললেন, 'কনগ্রাচুলেশন, তুমি নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্যে স্কলারশিপ পেয়েছো।'

ঠিক হলো, বাবা যাবে ওমাহায়। মেয়ে যাবে নর্থওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে ডরমিটরি-তে থাকবে। ষ্টেশনে বাবাকে বিদায় জানাতে যেয়ে নিজেকে বড় একা লাগছিল মেয়ের। আবার স্বাধীন জীবন শুরু করবে বলে উত্তেজনাও অনুভব করছিলো ক্যাথরিন। ট্রেনের জানালায় বাবার মুখ। সুন্দর অথচ দরিদ্র একটা মানুষ যে আশা করে একদিন সে পৃথিবীর মালিক হবে।

ষ্টেশন থেকে ফেরার সময় একটা কথা ভেবে ক্যাথরিনের হাসি পায়। ওমাহায় যেতে হচ্ছে বাঁচার প্রয়োজনে, চাকরীর জন্যে। অথচ বাবা ট্রেনে একটা ড্রইংরুম ভাড়া করেছে...

স্বপ্ন এবং উচ্চাশা। নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটির শত শত ছাত্র-ছাত্রী একদিন বলবে; স্কুলে আমি ক্যাথরিন অ্যালেকজাণ্ডারের সহপাঠী ছিলাম।

যতগুলো সম্ভব কোর্সে নাম লিখিয়েছে ক্যাথরিন। অবসর সময় সে জনপ্রিয় একটা রোস্তোরাঁয় ক্যাশিয়ারের কাজ করে হপ্তায় পনেরো ডলার পায়।

কোর্সের মাঝামাঝি সময় নাগাদ ক্যাথরিন বুঝতে পারে, এই ইউনিভার্সিটির সমস্ত ছাত্রীর মধ্যে যৌনসংগমের অভিজ্ঞতা নেই একমাত্র তারই। ডরমিটরিতে, ক্লাসরুমে, রেস্তোরায় মেয়েরা খোলাখুলি সেক্স নিয়ে আলোচনা করে।

'জেরী সত্যিই দারুণ। কিংকং-এর মত একজনের কথা।

'ওর পুরুষাঙ্গ না ওর মগজের কথা বলছো?' অন্যজন জিজ্ঞেস করলো।

'ওর মগজের দরকার নেই। কাল রাতে দু'বার ও আমায় চরম আনন্দ দিয়েছে।' প্রথম জনের জবাব।

'আরনি রবিনসনের সঙ্গে শুয়েছো কখনো? ওর জিনিসটা ছোট কিন্তু বেশ জোরালো...'

'আজ রাতে আমি আলেক্সের সঙ্গে শোবো। ওর জিনিষটা কেমন?'

'খুঁজে পাওয়া যায় না।'

এই সব অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে শুনতে ক্যাথরিনের মনে হয় তাহলে উনিশ বছর বয়সে নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটিতে আমিই একমাত্র মেয়ে, যার যৌনসঙ্গমের অভিজ্ঞতা নেই। ভারজিন ক্যাথরিন কী চার্চের সন্ন্যাসিনী হবে? কিন্তু কোন কোন যুবক ক্যাথরিনকে কাছে ডাকে না কেন?

মেয়েদের মধ্যে যৌনমিলনের ব্যাপারে যে পার্টনারকে নিয়ে কাড়াকাড়ি সে হলো ক্যাথরিনেরই স্কুলের সহপাঠি রন পিটারসন। অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ নিয়ে ইউনিভারসিটিতে এসেছে রন। লেন হাইস্কুলের মত নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভারসিটিতেও সে সমান জনপ্রিয়। ওদের ক্লাসের প্রেসিডেন্টও। চেহারা ও মুখ আরও সুন্দর হয়েছে। ক্লাসেয় পর দেখা হয়। ক্যাথরিনের বুক ধুকপুক করে।

'হাই···তুমি ..?' প্রথম দেখার প্রশ্ন রনপ্রিটারসনের।

'ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডার।'

'ইয়া। এই জায়গাটা দারুণ, তাই না?'

'ইয়া, খুব...

'আবার দেখা হবে।' এক রূপসী ব্লাণ্ড মেয়ে রনের সঙ্গে দেখা করবে বলে দাঁড়িয়েছিলো তার দিকে এগিয়ে গেল ও।

রাতে একলা বিছানায় শুয়ে ক্যাথরিন স্বপ্ন দেখে। রোম্যাণ্টিক উপন্যাসে যেমন তেমনি রন পিটারসন নিজের শার্ট খুলেছে, তার রোমশ বুকে হাত বোলাচ্ছে ক্যাথরিন। রন ট্রাউজার শার্ট খুলেছে, উলঙ্গ রন ক্যাথরিনকে তুলে নিয়ে বিছানার দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গিয়ে কাতরাচ্ছে রন। নাঃ ফ্যাণ্টাসিতেও যৌনমিলন হয় না।

ক্যাথরিন স্বপ্নে দেখে, রোমের শহরগুলিতে পুরোনো এক গির্জার বাইরে পুকুরের ধারে সে বসে আছে। পরণে দীঘল কালো ক্যাসক, মাথায় বিরাট টুপি। দেখতে ঠিক রনের মত এক ধর্মযাজক এলো, বললো, 'সিনোরিটা, আমি তোমায় ফলো করে এখানে এসেছি।'

'কিন্তু তুমি তো ধর্মযাজক.....'

'সিনোরিটা, প্রথমে আমি পুরুষ, পরে ধর্মযাজক

ক্যাথরিনকে সে জড়িয়ে ধরতে যায় এবং ক্যাসকের প্রান্ত পায় জড়িয়ে সে পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়। স্বপ্নে আবারো হতাশ হয় ক্যাথরিন।

ক্লাস শেষ করে রোজ ক্যাথরিন যেটাতে কাজ করে, সেই রেস্তোরাঁয় আসে রন পিটারসন। তার বুথে বন্ধুদের ভিড় জমে ওঠে। ক্যাথরিনকে দেখলে মাথা নাড়ে রন। কখনও নাম ধরে ডাকেনা। কখনও ডেট চায়না, এক গ্লাস জল পর্যন্ত চায়না, ক্যাথরিনের কুমারী শরীর উপভোগ করতে চাওয়া তো দূরের কথা।

অথচ এখানকার মেয়েদের মধ্যে ক্যাথরিনের চেয়ে সুন্দরী একটি মেয়েই আছে। জীন অ্যান, দক্ষিণের স্টেটের মেয়ে, মাথায় সোনালী চুল। সে রন পিটারসনের বান্ধবী। কোনো ছেলে ক্যাথরিনের সঙ্গে মিশতে চায়না কেন?

জবাবটা পরের দিন জানলো ক্যাথরিন।

জীন অ্যান বললো, 'মিস বিগ ব্রেন...'

আমার মগজ বড়, তোমার স্তনদুটো...মনে মনে ভাবলো ক্যাথরিন। কিন্তু, মুখে বললো, সাহিত্যের প্রশ্নগুলো বড্ড শক্ত, তাই না?'

'তুমি ওদের শেখাতে পারো। কিন্তু তুমি তো আরো অনেক কিছু শেখাতে পারো, তাই না?' পাল্টা প্রশ্ন করলো জীন অ্যান।

'তার মানে ?'

'সবাই বলে, তুমি ছেলেদের সঙ্গে মেশোনা, তুমি সমকামী, লেসবিয়ান তুমি আমাদের মতো নও।'

না, অসম্ভব, সে হোমো নয়, লেসবিয়ানও নয়, সে চায় পুরুষের ছোঁয়া, পুরুষের শরীর, মনে মনে বলে ক্যাথরিন।

ডরমিটরির জানলার বাইরে পূর্ব আকাশের রঙ হালকা হয়। সারা রাত ঘুমোয়নি ক্যাথরিন। তাকে তার কুমারীত্ব হারাতে হবে। এবং যে ভাগ্যবান পুরুষ এই কুমারী শরীর প্রথম উপভোগ করবে. তার নাম, রন পিটারসন।

তিন

সে ছিল এক রাজকন্যা। তার প্রথম স্মৃতি ; সাদা চাদর, লেসের চাঁদোয়া, লাল রিবন, নরম তুলোভরা খেলনা-জন্তু, সুন্দর খেলনা, সোনালী রঙের ঝুমঝুমি। সে কেঁদে উঠলেই কেউ তাকে কোলে নেয়, আদর করে। তার দুমাস বয়স হলে তার বাবা তাকে পেরাম্বুলেটরে চাপিয়ে বাগানে নিয়ে যায়, ফুলগুলো পুঁতে দিতে দিতে বলে, 'প্রিনসেস, ফুল সুন্দর, তুমি আরও সুন্দরী।'

বাড়িতে বাবা তার শক্ত কাঁধে মেয়েকে চাপিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখায় দূরের উঁচু বাড়িগুলোর ছাদ। বাবা বলে, 'প্রিনসেস, এই তোমার রাজ্য।' সমুদ্রে নোঙরফেলা জাহাজের মাস্তুল দেখিয়ে বাবা বলে, 'প্রিনসেস, একদিন এসব তোমার হবে।'

দুর্গের ভেতর আর অনেকে আসে। বিশেষ কেউ কেউ তাকে কোলে তোলার অনুমতি পায়। অন্যেরা উঁকি দিয়ে দেখে ; দোলনায় শুয়ে আছে ছোট রাজকন্যা। অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দরী, মাথায় সুন্দর সোনালী চুল, নরম চামড়ার মধুর রং। বাবা বলে, 'যে কেউ দেখলে রাজকন্যাই বলবে। একদিন সুন্দর এক রাজপুত্তুর এসে তোমায় নিয়ে যাবে।' গরম লাল কম্বলটা মেয়ের শরীরে জড়িয়ে দেয় বাবা। মেয়ে ঘুমোয়। জাহাজ, দীঘল মাস্তুল, দুর্গ—এসব কিছুর স্বপ্ন দেখে।

এবং পাঁচ বছর বয়স হবার আগে হেলেন কখনো বোঝেনি যে সে মার্সেই-এর এক গরীব মাছের ব্যাপারীর মেয়ে। ছোট চিলেকোঠার

জানালা দিয়ে যে দুর্গগুলো সে এতোকাল দেখেছে, সেগুলো মাছের আড়ৎ। এবং যে নৌবাহিনীর স্বপ্ন দেখেছে, সেগুলো মাছ ধরা জাহাজ। রোজ সকালে মারসেই থেকে সমুদ্রে পাড়ি দেয়, সন্ধ্যায় ওয়াটারফ্রন্টের ডেকে ফিরে মাছ ঢেলে দেয়।

এই হলো হেলেন পেইসের রাজ্য।

বাবার বন্ধুরা বাবাকে সাবধান করেছিলো, ছোট মেয়ের মাথায় আজেবাজে ভাবনা ঢুকিওনা, জ্যাক। বড় হয়ে মেয়ে ভাববে, ও সবার থেকে বড়, সবার থেকে ভালো, ওরা ঠিকই বলেছিলো।

মার্সেই বন্দরে মারপিট, খুনখারাপি লেগেই আছে। নাবিকদের পকেটে টাকা আছে। সেই টাকা ছিনিয়ে নেবার ধান্দায় আছে বেশ্যা, বেশ্যার দালাল, গুণ্ডা ও মস্তান। কিন্তু ফ্রান্সের অন্য যে কোন এলাকার থেকে মার্সেইর তফাৎ এই যে এখানকার জেলেরা পৃথিবীর যে কোনো বন্দরে জেলেদের মত ঐক্যবদ্ধ বলে, এখানকার মানুষের মধ্যে একতার একটা ভাব গড়ে উঠেছে। ওরা পরস্পরের দুঃখসুখের ভাগ নেয়।

জ্যাক পেইসের সুন্দরী মেয়ে হয়েছে বলে ওর প্রতিবেশীরা খুব খুশি। এই নোংরা অশ্লীল শহরের বুকে অলৌকিক কোনো ঘটনার মতই জন্ম নিয়েছে রূপসী এক রাজকন্যা।

মেয়ে যে এতো সুন্দরী হতে পারে তা ওর বাবা-মাকে দেখে আদৌ বোঝা যায় না। হেলেনের মা চাষীর মেয়ে। ভারিক্কী চেহারা, শিথিল স্তন, ভারী উরু নিতম্ব। হেলেনের বাবার চুল ভিজে বালির রং। দেখতে মোটাসোটা, চওড়া কাঁধ, ছোট্ট চোখদুটোর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। প্রথমে সে ভেবেছিলো, প্রকৃতি কোনো ভুল করেছে। এই অপূর্ব সুন্দরী সোনালী চুলের পরী তাদের মেয়ে হতে পারে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই

রূপ ঝরে যাবে এবং বন্ধুদের মেয়েদের মতই দেখাবে ওকে, কিন্তু দিনে দিনে আরও সুন্দরী হলো হেলেন।

সোনালী চুল সুন্দরী মেয়ের জন্মে অতটা অবাক হয়নি একমাত্র হেলেনের মা। কেননা, ওর জন্মের ন'মাস আগে সোনালী চুল লম্বা চওড়া সুদর্শন এক নরওয়েবাসী নাবিক জ্যাকের অনুপস্থিতির সুযোগে ওর বিছানায় পনেরো মিনিট কাটিয়েছিল। মেয়ে অত সুন্দরী হওয়ায় মায়ের ভয় হয়েছিলো স্বামী হয়তো সন্দেহ করবে এবং জানতে চাইবে যে এই মেয়ের সত্যিকারের বাবা কে? কিন্তু মেয়ে দেখে স্বামীর অহংকার জেগে উঠলো। সে বললো, হয়তো কোন নরভিক পূর্বপুরুষের রক্ত আছে আমার ধমনীতে। 'হয়তো মেয়ের চেহারায় তারই চেহারার ছাপ। তবে মেয়ের মুখের সঙ্গে আমার মুখের অনেক মিল।' মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে হেলেনের মা। মনে মনে ভেবেছে, পুরুষ মানুষ কত বোকা।

বাবাকে পছন্দ করে হেলেন। সে মেয়ের সঙ্গে খেলা করে, তার গায়ে অদ্ভুত সব গন্ধ, সে চট করে রেগে যায়, বউকে চড় মারে। মা যখন কাঁদে, চেঁচায়, যন্ত্রণা ছাড়াও সেই চীৎকারে থাকে জান্তব এক যৌন আনন্দ। মাকে ঈর্ষা করে হেলেন।

হেলেনের বাবা কিন্তু মেয়েকে কখনো মারেনা। সে ডুকে নিয়ে যায়, বন্ধুদের দেখায়। বাবাকে খুশি করার জন্যে বাবার পছন্দসই রান্নাগুলো রাঁধতে শেখে মেয়ে।

হেলেনের যখন সতেরো বছর, তার শৈশবের সৌন্দর্য যৌবনে বিকশিত হয়েছে। কঠিন ও তুঙ্গ স্তন, চিকন কোমর, সুটোল নিতম্ব এবং ছন্দিল পা ও গোড়ালি। গলার স্বর নরম। তার ব্যক্তিত্বে তীব্র যৌন আবেদনের ছাপ। এবং অন্তরালে যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে নিষ্পাপ কৌমার্যের

এক দ্বীপ। দুটোর যোগাযোগ খুবই অদ্ভুত। সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই পুরুষেরা নানা প্রস্তাব করে। মার্সেইর বেশ্যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটলে যেসব খারাপ প্রস্তাব শোনে তার সঙ্গে এর তফাৎ আছে। হেলেন আর সব মেয়ের থেকে আলাদা, এরকম মেয়ে সে হয়তো জীবনে আর দেখবেনা, একথা বোঝে সব পুরুষই। তাই ওর জন্যে যত বেশী সম্ভব খরচা করতে সব পুরুষই সবসময় প্রস্তুত

হেলেনের বাবা নিজের মেয়ের সৌন্দর্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন। হেলেন পুরুষের বুকে কামনার ঢেউ জাগায়, সে জানে। সেক্সের ব্যাপারে সে বা তার বউ কখনও হেলেনের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা না করলেও সে জানে, এখনও তার মেয়ে কৌমার্য হারায়নি। এই কৌমার্যই তো মেয়ে মানুষের পুঁজি। চাষার ছেলে জ্যাক তার স্বভাবসুলভ ক্রুর ও কুট-বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিয়েছে যে প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে এই সুন্দর মেয়ে তার ঘরে এসেছে। তাকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে তাকে কিছু টাকাপয়সা কামাতে হবে। বাপ হিসেবে সে মেয়েকে খাইয়েছে, পরিয়েছে বড় করেছে। এখন সেসব খরচা ফেরৎ আসবে সুদে আসলে। মেয়ে যদি এখন বড়লোকের রক্ষিতা হয়, মেয়েও সুখে থাকবে, তারাও আরামে থাকবে। সময়টা এমনই যে সৎ লোকের পক্ষে এখন দুপয়সা কামানো খুবই কঠিন। নাৎসী ঝটিকাবাহিনী বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা ইউরোপে। ইউরোপের বুকে এখন যুদ্ধের ছায়া। নাৎসীরা অষ্ট্রিয়ায় ঢুকেছে। সুদেতেন ও শ্লোভাকিয়া ওদের আয়ত্তে।

ঘটনার প্রভাব সবচেয়ে বেশী এখন ফ্রান্সে। ফরাসী সরকার প্রতিরক্ষায় বিপুল অর্থ ব্যয় করার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দাম চড়তে শুরু করেছে। মাছ ধরাও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কী হবে ওর?

এই সমস্যার একটাই তো সমাধান। তার মেয়েকে কোন বড়লোকের রক্ষিতা হতে হবে। মুশকিলটা এই যে জ্যাক কোন বড়লোককে চেনেনা। তার বন্ধুরাও তো তারই মত গরীব।

স্কুল এখন আর ভালো লাগছে না হেলেনের। আজকাল সে চঞ্চল হয়ে উঠছে, চাকরী করার জন্য। সে বলে, 'বাবা, আমি মডেলের কাজ করতে পারি।'

প্রত্যেকদিন বিকেলে এখন মাছের ব্যাপারী জ্যাক পেইস বাড়ি ফিরে স্নান করে মাছের গন্ধ শরীর থেকে ধুয়ে ফেলে। ভালো স্যুট পরে মার্সেইর ধনী এলাকা ড্রেস সালেঁ জলাতে ঘোরাফেরা করে। সিল্ক ও লেসের জগতে বিশ্রী একটা চাষাকে মানায় না। কিন্তু, সে কাজে এসেছে। এবং সে যা খুঁজছিলো তা সে খুঁজে পেলো। মার্সেইর সেরা ড্রেস-শপ নয়, মসিয়ঁ অগাস্তে লাঁশঁর ড্রেসের দোকান। মসিয়ঁ লাঁশঁর বয়স পঞ্চাশ, মাথায় টাক, ছোট পা, মুখে লোভী ভাব। তার বউ রোগা, হাড্ডিসার একটা কোদালের মত, ফিটিং রুমে দরজিদের ওপর নজর রাখে। মসিয়ঁ লাঁশঁ ও তার বউকে দেখে মাছের ব্যাপারী জ্যাক বুঝে ফেলে, এই লোকই তার প্রয়োজন মেটাতে পারে।

সস্তা পোষাক পরা অপরিচিত লোক দোকানে ঢুকতে লাঁশঁ একটু বিরক্ত রুক্ষভাবে বলে, 'তোমার জন্যে কী করতে পারি?' 'আমিই আপনার জন্যে বোধ হয় কিছু করতে পারি, মসিয়ঁ জ্যাক চোখে টিপে লাঁশঁর বুকে আঙ্গুল ছুঁয়ে বলে, 'আমার মেয়ে আপনার এখানে কাজ করবে। কাল নটার সময় ও আসবে।'

'আমি তো...'

ততোক্ষণে জ্যাক চলে গেছে।

পরের দিন সকালে জ্যাক পেইসকে দোকানে ঢুকতে দেখে অগাস্তে লাঁশঁ ভাবে, ম্যানেজারকে ডেকে একে তাড়াতে হবে। কিন্তু, প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলতে হয় ওকে।

অগাস্তে লাঁশঁ দেখে, জ্যাক পেইসের পেছনে অবিশ্বাস্য সুন্দরী একটা মেয়ে। হেলেন বলে, গুড মরনিং, মসিয়ঁ। 'গুড মরনিং, মসিয়ঁ। বাবা বলছেন, আপনি আমায় চাকরি দেবেন···'

'হ্যাঁ, আমি-মানে, আমি কি বলবে বুঝতে পারছেনা লাঁশঁ।

'আপনারা কথা বলুন। আমি চলি।' লাঁশঁর কাঁধে থাপ্পড় মেরে এবং চোখ টিপে চলে গেল হেলেন পেইসের বাবা জ্যাক পেইস।

প্রথম দুটো সপ্তাহে হেলেনের মনে হলো, সে যেন অন্য এক দুনিয়ায় এসেছে। সুন্দর পোষাক পরে তারা দোকানে ড্রেস কিনতে আসে, তারাও ওর চেনা জেলে ও মাছের ব্যাপারীদের থেকে আলাদা। এই প্রথম চারপাশে মাছের গন্ধ শুকতে হয়না হেলেনকে। বাবার জন্যেই মসিয়ঁ লাঁশঁর ড্রেসের দোকানে মডেলের এই চাকরিটা পেয়েছে ও। বাবা যেভাবে মসিঁয় লাঁশঁকে কব্জা করেছে, সেজন্যে সে সত্যিই গর্বিত। এখনও সপ্তাহে দু'তিনবার এই দোকানে আসে হেলেনের বাবা। মসিয়ঁ লাঁশঁ আর হেলেন কনিয়াক বা বীয়ার খেতে বাইরে যায়। দুজনে এরই মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মসিয়ঁ লাঁশঁ খুব পছন্দ নয় হেলেনের। তবে তার সঙ্গে সরাসরি ঘনিষ্ঠ হওয়ারও তেমন চেষ্টা করেনি এই লাঁশঁ। লোকটা নাকি বউকে যমের মত ভয় করে। একবার ষ্টকরুমে একটা মডেল মেয়ের সঙ্গে খারাপ কাজ করার সময় বউয়ের কাছে নাকি হাতে নাতে ধরা পড়ে লাঁশঁ। বউ খেপে যেয়ে আর একটু হলে বড় একটা কাঁচি দিয়ে মসিয়ঁ লাঁশঁর অণ্ডকোষ কেটে দিতো। হেলেন জানে, মসিয়ঁ

লাঁশার লোভী দৃষ্টি সর্বত্র অনুসরণ করে। তবে খারাপ কিছু কখনও করেনা মসিয়ঁ। বোধহয় ও ওর বাবা জ্যাক পেইসকে ভয় পায়।

বাড়ির আবহাওয়া এখন আগের থেকে ভালো। বাবা আর কথায় কথায় মাকে মারে না। ঝগড়াঝাটিও কমে গেছে। এখন ডিনারে ষ্টিক ও রোষ্ট খেতে পাওয়া যায় এবং ডিনারের পর চামড়ার থলি থেকে সুগন্ধি তামাক নিয়ে নতুন পাইপে ভরে জ্যাক। সে নতুন সানডে স্যুট কিনেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃই খারাপ হচ্ছে এবং বাবা ও তার বন্ধুদের বদ্ধমূল ধারণা যে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধতে চলেছে। অন্যেরা যখন জীবিকার ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু এসব ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তাই নেই জ্যাক পেইসের।

১৯৩০-এর ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানীর ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর হিটলারের সেনাবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলো।

দুদিন পরে জারমানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

সেনাবাহিনীতে যুবকদের ভর্তি করার কাজ শুরু হলো। রাতারাতি রাস্তাগুলো ইউনিফর্মপরা সৈন্যে ভরে গেল। যা ঘটছে তা অনিবার্য বলে মেনে নিচ্ছে সবাই। যেন পুরোনো একটা ফিল্ম আবার দেখা হচ্ছে। কিন্তু কারো মনে ভয় নাই।

অন্য সব দেশের পক্ষে অপরাজেয় নাজী জার্মান সেনাবাহিনীর ভয়ে কাঁপা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন যা দুর্গের মত, যা পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব, যা এক হাজার বছর যে কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে রক্ষা করবে। কারফিউ চলেছে, খাবার রেশন করা হয়েছে কিন্তু জ্যাক ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

শুধুমাত্র একদিনই সে মাথা খারাপ করেছিলো। অন্ধকার রান্নাঘরে পরিচিত একটি যুবককে চুমু খাচ্ছিল হেলেন। হঠাৎ আলো জ্বললো এবং আতংকিত সেই ছেলেটিকে জ্যাক বললো, গেট আউট, নোংরা শূয়োর, আমার মেয়ের ধারে কাছে এসো না।

ছেলেটা চলে যাবার পর বাবাকে বোঝাতে গেল হেলেন, এতে এমন কিছুই হয়নি। কিন্তু বাবা এতো রেগে গেছে যে সে কিছুই শুনতে রাজি নয়। বাবা গর্জন করে ওঠে, নিজেকে অত সস্তায় বিলিয়ে দিওনা। আমার রাজকন্যার উপযুক্ত নয় ওই ছেলেটা।

রাত জেগে হেলেন পেইস ভাবে, তাকে কত ভালোবাসে তার বাবা। এবং এমন কিছু সে আর কোনোদিন করবেনা, যাতে তার বাবা দুঃখ পায়।

একদিন দোকান বন্ধ হবার ঠিক আগে এক খদ্দের আসায় লাঁশ হেলেনকে কয়েকটা ড্রেস পরে দেখাতে বলে। কাজ শেষ হবার পর পেছনে অফিসে হিসেব মেলাতে ব্যস্ত মাদাম লাঁশ। দোকানে মসিয়ঁ লাঁশ ও হেলেন ছাড়া আর কেউ নেই।

ড্রেসিং রুমে ঢুকে পোশাক বদলাচ্ছিলো হেলেন। এখন তার পরণে স্রেফ ব্রা আর প্যান্টি। ঠিক এই সময় ভেতরে ঢোকে মসিয়ঁ লাঁশ। তার দৃষ্টি অস্বাভাবিক ও ঠোঁট দুটো কাঁপছে। তাড়াতাড়ি পোশাকের দিকে হাত বাড়ায় হেলেন। কিন্তু তার আগেই হেলেনের দু'পায়ের ফাঁক নিজের হাত গলিয়ে শক্ত করে টেনে ধরে লাঁশ বলে, তুমি সুন্দরী। আমি তোমাকে খুশি করবো। সেই মুহূর্তে লাঁশ তার বউয়ের ডাক শুনে অনিচ্ছা সত্বেও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাড়ি যেতে যেতে হেলেন ভাবে, কথাটা বাবাকে বলা উচিৎ কিনা। না, থাক। বাবা হয়তো রেগে মসিয়ঁ লাঁশকে খুন করে ফেলবে।

তাছাড়া লাঁশকে তার অপছন্দ হলে চাকরিটা খুব পছন্দ হেলেনের। এই চাকরি সে খোয়ালে বাবা হয়তো দুঃখ পাবে। নাঃ, বাবাকে কিছু না বলাই ভালো।

পরের শুক্রবার সকালে লাঁশঁর বউ ফোন পেলো, তার মা অসুস্থ। বউকে রেলষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে দোকানে ফিরে এসে লাঁশঁ হেলেনকে অফিসে ডেকে বললো, এই উইক-এণ্ডে আমি ভিয়েনে বেড়াতে যাচ্ছি। ওখানে পৃথিবীর একটা সেরা রেস্তোরাঁ আছে। সেই রেস্তোরার নাম লা পিড়ামিড। ওই রেস্তোরাঁয় খেতে অনেক খরচ হয়। তবে আমার সঙ্গে যারা ভালো ব্যবহার করে, আমিও তাদের জন্যে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করিনা। এই উইক-এণ্ডে আমার সঙ্গে যাবে তুমি। রেডি হতে কতক্ষণ সময় লাগবে ?

'কখনো না।' সোজা সাপটা জবাব হেলেনের।

মসিয়ঁ লাঁশঁ লহমার জন্যে তার দিকে তাকিয়ে রাগে মুখ লাল করে টেলিফোনের রিসিভার তোলে। এক ঘণ্টা পরে হেলেনের বাবা দোকানে এসে ঢুকতে আতংক কেটে যায় হেলেনের। গোলমাল বুঝে মেয়েকে বাঁচাতে ভেতরে এসেছে বাবা।

'বাবা, তুমি এসেছো ? আমি.....

'মসিয়ঁ লাঁশঁ আমায় বললেন যে তিনি তোমায় চমৎকার একটা অফার করেছিলেন। অথচ তুমি···রাজি হলে না ? নির্বিকার কণ্ঠে বলে জ্যাক।

'অফার ? উইক-এণ্ডে ও আমায় ওর সঙ্গে যেতে বলেছে.....'

'তুমি না বললে ?'

ঠাস করে মেয়ের গালে চড় মারে বাবা। স্তম্ভিত মেয়ে যেন কুয়াশার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট শোনে, তার বাবা বলছে, 'ষ্টুপিড! ষ্টুপিড! য়্যু সেলফিশ লিটল বিচ! নিজের ছাড়া সংসারের কথা ভাবার সময় এসেছে তোমার।' আবার ঠাস করে মেয়ের গালে চড় মারে বাবা।

এবং আধ ঘণ্টা পরে, বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বাবা দেখে, মেয়েকে গাড়িতে চাপিয়ে ভিয়েনে উইক-এণ্ডে ফুর্তি করতে যাচ্ছে মসিয়ঁ লাঁশঁ।

হোটেলের ঘরে ডবল বেড, সস্তা ফারনিচার, ওয়াশষ্ট্যাণ্ড, বেসিন। টিপস পেয়ে বেলবয় বিদেয় হতেই হেলেনের পোষাক খুলতে শুরু করে মসিয়ঁ লাঁশঁ। ওর নিটোল স্তনদুটো সে তপ্ত ও ভিজে হাতে টেপে। স্কার্ট ও প্যান্টি খুলে নিয়ে ওকে বিছানায় ফেলে দেয় লাঁশঁ। হেলেন নড়াচড়া করেনা, প্রতিবাদ করে না। তার কানে আসে বাবার কণ্ঠস্বর, 'মসিয়ঁ লাঁশঁর মত দয়ালু ভদ্রলোক তোমার ভার নিতে চাইছেন, এজন্যে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।'

লাঁশঁ পোষাক খুলে মেঝেয় ছুঁড়ে দেয়। বলে, 'ইউ হ্যাভ নেভার বীন্ ফাকড? তোমার বাবা বলেছিলো, তুমি নাকি কুমারী? পুরুষ কাকে বলে এবার তোমায় দেখাবো।' লাঁশঁর ভুঁড়িটা এখন হেলেনের পেটের ওপর, যোনির ভেতরে শক্ত হয়ে খোঁচা দিচ্ছে তার পুরুষাঙ্গ। এই কুৎসিত শরীর, এই জান্তব মুখ, এই সেই প্রিন্স যার জন্যে তার বাবা তাকে অযোগ্য কারো কাছে কৌমার্য নষ্ট করতে দিতে মানা করেছে? এই সেই রাজকুমার? বাবার নতুন পাইপ, নতুন স্যুট, ষ্টিক, রোষ্ট ওরই পয়সায় কেনা?

এবং তখনই···রাজকন্যার মৃত্যু হয় এবং বেশ্যার জন্ম হয়। প্রচণ্ড একটা ঘৃণা হেলেন পেইসের মনের মধ্যে জেগে ওঠে। তার বাবা তাকে ঠকিয়েছে। বাবাকে সে কোনোদিন ক্ষমা করবেনা। লাঁশঁর ওপর ওর এতো রাগ হয়না। সব পুরুষের একই দুর্বলতা। এখন থেকে সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে হেলেন পেইস। সত্যিই প্রিন্সেস হবে। ব্যাপারটা সহজ। পুরুষেরা পৃথিবী শাসন করে। কেননা তাদের শক্তি আছে, টাকা আছে। এবং রূপ দিয়ে, যৌবন দিয়ে মেয়েরা শাসন করে পুরুষকে। হেলেনকে এর সব শিখতে হবে।

মসিয়ঁ লাঁশঁর শরীরের নীচে শুয়ে যোনির ভেতর পুরুষাঙ্গের চাপ এবং মেয়েলী শরীরের প্রতিক্রিয়া অনুভব করে ও। মাঝবয়সী স্ত্রীর রোগা শরীর এবং মার্সেইর বেশ্যাদের ক্লান্ত শরীরে অভ্যস্ত মসিয়ঁ লাঁশঁ এক কুমারী যুবতীকে শরীরের নীচে পেয়ে ভাবছে যেন কোন অঘটন ঘটে গেছে।

যৌনমিলন শেষ হলে হেলেন বলে, 'চুপচাপ শুয়ে থাকো।' তারপর সে শয্যাসঙ্গীর শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় জিভ ও ঠোঁট বুলিয়ে পুরুষকে কিভাবে পাগল করে দেওয়া যায় তাই নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করে। ব্যাপারটা এতো সহজ, হেলেন ভাবে, প্রেমের শয্যা তার স্কুল, তার শিক্ষার ক্ষেত্র। এবং এইভাবে পুরুষরা তার ক্ষমতার অধীনে আসবে।

তিনদিন হোটেলে কাটালো ওরা। একবারও ওরা 'লা পিরামিড' নামের সেই বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় যায়নি।

এর আগে দোকানের মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করেছে লাঁশঁ। বেশ্যাদের সঙ্গে দরদাম করেছে। রক্ষিতাদের উপহার দিতে কার্পণ্য করেছে। কিন্তু মার্সেইতে ফেরার সময় তার মনে হয়, সে ফ্রান্সের সবচেয়ে সুখী পুরুষ।

'হেলেন, এখন থেকে তুমি একটা ফ্ল্যাটে থাকবে। রোজ লাঞ্চের সময় আমি আসবো। সপ্তাহে দু'তিন দিন তোমার ওখানে ডিনার খাব। এই নাও টাকা। ফ্ল্যাটের খোঁজ করো। পছন্দ হলে এই টাকা ডিপোজিট হিসেবে জমা দিও। আমি নিজের চোখে ফ্ল্যাট দেখবো, তারপর ভাড়া নেবো।' গদগদ করে বলে লাঁশ।

'অতো কম টাকায় হবেনা। আমি সত্যিকারের সুন্দর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চাই। যেখানে আমরা দুজনে সুখী হবো।'

'আমি তো ধনী লোক নই।'

জবাবে হেলেন হাসে, লাঁশর উরুতে হাত রাখে। ওয়ালেট থেকে আরও অনেক ফ্রাঁ বার করে লাঁশ। সে ব্যবসায়ী, সে জানে টাকাটা ইনসিওরেন্সের কাজ করবে এবং হেলেন তাকে ছেড়ে যাবে না।

অথচ মসিয়ঁ লাঁশ চলে যেতেই সে জিনিষপত্র প্যাক করে রাত দশটায় প্যারীর ট্রেনে ওঠে।

প্যারী। এই তার শহর। মার্সেই এখন যেন অপরিচিত এক নগরী। জনতা, উত্তেজনা, উন্মাদনা। প্যারী!

'ট্যাক্সি ড্রাইভার, সস্তা কোন হোটেলো নিয়ে চলো...'

'তুমি এ শহরে নতুন, চাকরি খুঁজছো?' কখনও মডেলিং করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বোন বড় একটা ফ্যাশন হাউসের মডেল। একটা মেয়ে চলে গেছে, একটা চাকরি খালি আছে। চেষ্টা করে দেখবে?'

'খুব ভালো হবে।'

মর্ত্যের বিলাসপুরী প্যারী। স্বপ্নের নগরী, যাদুনগরী। তার ষ্টাইল আলাদা, ফ্যাশন আলাদা, ঘ্রাণ পর্যন্ত আলাদা।

রু্য দ্য প্রোভেইনস-এর সামনে গাঢ়-ধূসর পাথরের তৈরী বাড়ির সামনে থামে ট্যাক্সি। ড্রাইভার বলে, 'ট্যাক্সি ভাড়া দু ফ্রাঁ। আমি যে খবরটা দিলাম, তার দাম দশ ফ্রাঁ। আমার বোনের নাম জীনেৎ...'

সুটকেস হাতে হেলেন। কলিং বেল টিপতে কালো অ্যাপ্রণ পরা ঝি দরজা খোলে।

'ইয়েস ?'

'এক্সকিউজ মী। এখানে নাকি মডেলের চাকরি খালি আছে? জীনেতের ভাই আমায় পাঠিয়েছে।'

'ভেতরে এসো। আমি মাদাম দেইলিজকে ডাকছি।'

মাদাম দেইলিজ-এর বয়স চল্লিশের কোঠায়। বেঁটে, মোটা। টানা চোখ। পরণের গাউনটিরই দাম দু'হাজার ফ্রাঁ হবে।

'তুমি কোথা থেকে আসছো ?'

'মার্সেই।'

'মাতাল নাবিকদের ফুর্তির জায়গা, মন্তব্য করে মহিলা, 'বয়স কত ?'

'আঠারো।'

'প্যারীতে কোন আত্মীয় আছে ?'

'না'

'খুব ভালো। এখনই কাজ শুরু করতে রাজি ?'

'নিশ্চয়ই।' চট করে বলে হেলেন।

সিঁড়ির ওপর থেকে ভেসে আসে হাসির শব্দ। মোটা মাঝবয়সী পুরুষের কাঁধে হাত রেখে নামছে লাল-চুল যুবতী, তার পরণে পাতলা নাইট ড্রেস।

'এরই মধ্যে হয়ে গেল ?'—মাদাম জানতে চায়।

'লোকটা বলে, 'অ্যানজেলা আর পারছেনা। এই সুন্দরী কে?'

'নতুন, নাম ইভেইৎ, এসেছে আঁতিকেই থেকে, এক রাজপুত্রের মেয়ে—'

'আই হ্যাভ নেভার সীন্ড এ প্রিনসেস। রেট কত?'

'পঞ্চাশ ফ্রাঁ।'

'ঠাট্টা করছো। তিরিশ দেবো।'

'চল্লিশ। পয়সার দাম পাবে তুমি।'

'বেশ, তাই দেবো।'

ওরা হেলেনের দিকে ঘোরে। দেখে ও উধাও।

প্যারীর রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে বেড়াচ্ছে হেলেন। লিদো আর্কেডের প্রত্যেকটা দোকানের শো-কেস দেখছে। জুয়েলারী, পোষাক, সেন্ট, অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত। একদিন এসব ওরও হবে। কিন্তু এখন সে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। মানিব্যাগ ও স্যুটকেস পড়ে আছে মাদাম দেইলিজ-এর ওখানে। ওখানে ফিরে যাবে না। সে ওগুলো আনতে অন্য কাউকে পাঠাবে। ওখানে যা ঘটলো, ওটা যে মডেলিং এর জায়গা নয়, ড্রেস শপ নয়, ওটা যে বেশ্যাবাড়ি তা বুঝতে পেরেছে। এসবে খুব একটা আশ্চর্য বা অভিভূত হয়নি হেলেন। সে বেশ্যা ও রাজ পুরুষের উপপত্নীর তফাৎ জানে। সাধারণ বেশ্যা কখনও ইতিহাসের গতি বদলাতে পারে না। রাজনর্তকীরা ইতিহাস বদলায়। না, সাধারণ বেশ্যা হতে রাজি নয় ও। এখন তার কাছে পয়সা নেই। কাল সে চাকরি খুঁজবে। গোধূলি নামছে। ব্যবসায়ী এবং হোটেলের দারওয়ানরা সম্ভাব্য জার্মান বিমান আক্রমণের কথা ভেবে জানলায় ব্ল্যাকআউটের পর্দা লাগাচ্ছে। হেলেনের ক্ষিদে পেয়েছে। কোনো পুরুষ যদি ডিনারের দাম দেয়। ক্রীয়

হোটেলের লবিতে ঢুকে এলিভেটরের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে হেলেন। অগাস্তে লাঁশকে বোকা বানাতে সময় লাগেনি। অন্য পুরুষকে বোকা বানাতেই বা কষ্ট হবে কেন? পুরুষেরা আসলে খুব জটিল প্রকৃতির, ওদের পুরুষাঙ্গ যখন শক্ত হয়ে ওঠে, মনটা তখন নরম হয়। পুরুষাঙ্গ যখন নরম, মনটা তখন কঠোর নির্মম। মেয়েমানুষের কাজ ওদের পুরুষাঙ্গটা শক্ত করে তোলা যাতে ওরা নরম মনে মেয়ে মানুষের দরকারী সব কিছু হাসিমুখে দিতে রাজি হয়। সঙ্গীহীন কোনো পুরুষ ডিনার খেতে এলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার পয়সায় ডিনার খাওয়া খুব একটা শক্ত হবেনা রূপসী যুবতী হেলেনের পক্ষে।

'কিছু মনে করবেন না, মাদমোয়াজেল, কারো জন্যে বুঝি অপেক্ষা করছেন?' দশাসই চেহারার লোকটার পরণে কালো স্যুট। পেশায় বোধ হয় হোটেল ডিটেকটিভ।

'হ্যাঁ, এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'তিনি কী এই হোটেলে থাকেন?'

'না, মানে·····

'আপনার আইডেনটিটি কার্ড দেখতে পারি?'

'আমি, ওটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'আমার সঙ্গে আসুন।' ডিটেকটিভ শক্ত হাতে ওর হাত ধরে।

সেই মুহূর্তেই···আর একজন তার অন্য হাতটা ধরে বলে, 'ককটেল-পার্টিতে বড্ড দেরী হয়ে গেল, ডারলিং, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছো বুঝি?'

অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে হেলেন দেখে, অপরিচিত এই যুবকের পরণে সৈনিকের ইউনিফর্ম, চুলের রং নীলচে, কালো চোখের রং ঝড়ের

সমুদ্রের মত। মুখটা প্রাণবন্ত, জীবন্ত, যেন এক্ষুণি হাসবে, চোখের পাতা দীঘল ও পুরু এবং পুরুষালী চোয়ালে গভীর ভাঁজ না থাকলে এই সুন্দর মুখ মেয়েলী মনে হতো।

'ডার্লিং এই লোকটা তোমায় বিরক্ত করছে?' ডিটেকটিভের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে ভারী গলায় যুবক বলে।

'আমি দুঃখিত স্যার,' ডিটেকটিভ বলছে, 'আমি ভুল বুঝেছিলাম। খারাপ মেয়েরা এখানে এমন সব ঝামেলা বাঁধাচ্ছে, মাদমোয়াজেল, কিছু মনে করলেন না তো?'

হেলেন হতভম্বের মত মাথা নাড়ে।

যুবক ডিটেকটিভকে বলে, 'মাদমোয়াজেল ভালোমানুষ বলে বেঁচে গেল। ভবিষ্যতে সাবধানে কাজ কোরো।'

হেলেনের হাত ধরে দরজার দিকে যায় যুবক। হেলেন বলে, মসিয়ঁ, কিভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো···

'পুলিশদের আমি ঘেন্না করি। ট্যাক্সি ডাকবো?'

'না।'

'কিন্তু ডিটেকটিভ এখন নজর রেখেছে তোমার ওপর। এখান থেকে চলো।'

'আমার কোথাও যাওয়ার নেই।'

পকেট থেকে টাকা বার করছে যুবক।

'টাকা চাইনা।'

'তবে কী চাও?'

'তোমার সঙ্গে ডিনার খেতে চাই।'

'সরি, ডেট আছে, দেরী হয়ে গেছে, বিদায়...' ও ট্যাক্সি ডাকছে। ডিটেকটিভ এগিয়ে আসছে। অচেনা যুবক ওর হাত ধরে ট্যাক্সিতে তোলে। ডিটেকটিভ বোকার মত চেয়ে থাকে। হেলেন বলে, 'তোমার ডেট?'

'পার্টিতে যাচ্ছি। তুমিও চলো। আমার নাম ল্যারী ডগলাস। তুমি?'

'হেলেন পেইস।'

'কোথা থেকে এসেছো?'

'জাঁতিবেই। আমি রাজকন্যা। তুমি?'

'আমেরিকান। ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্স আমেরিকান পাইলটদের একটা গ্রুপের নাম দিয়েছে ঈগল স্কোয়াড্রন। আমি ওই স্কোয়াড্রনের পাইলট। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ না দিয়ে ভুল করছে। হিটলার পৃথিবী শাসন করতে চায়। ওকে রুখতে হবে···

হিটলার, তার রণকৌশল, লীগ অফ নেশনস থেকে জার্মানীর হঠাৎ সরে যাওয়া, জাপান ও ইতালীর সঙ্গে জার্মানীর চুক্তি—এইসবের কথা বলছে ল্যারী ডগলাস। তার কথায় মুগ্ধ হয়ে শুনছে রূপসী হেলেন।

রু্য শেইমিন ভেয়াৎ-এ পার্টি। সবাই যুবক বা যুবতী; ওরা হাসছে, চেঁচাচ্ছে। কোনো যুবক আর হেলেনের কাছে আসছেনা। বড্ড গরম। হঠাৎ, কানে ল্যারী বলে, 'চলো, যাই।'

ব্ল্যাকআউটে অন্ধকার প্যারী। কালো সমুদ্রে নিঃশব্দ মাছের মত সাঁতার দেয় দুজনে। ট্যাক্সি নেই। ছোট্ট এক বিসত্রোয় ডিনার খেতে ঢোকে ওরা। হেলেন নিজের কথা বলে। ল্যারী জানায়, সে সাউথ বোষ্টনে থাকে। তার পূর্বপুরুষরা জাতে আইরিশ।

'এতো ভালো ফরাসী ভাষা শিখলে কী করে ?' হেলেনের প্রশ্ন।

'আমার বাবা স্টকমার্কেটের রইস ছিল। তখন আমি অাঁতিবেইয়ে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতাম। এখন বাবা সর্বস্বান্ত। মাদাম সেইলিজে সেই বাড়িতে চলো।'

এবারও সেই ঝি দরজা খোলে। মাদাম বলে, 'গুড ইভনিং, মসিয়ঁ। মাদমোয়াজেল মত বদলেছে ?'

'না, প্রিন্সেসের স্যুটকেস ও ব্যাগ দাও।' গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দেয় ল্যারী।

একটু পরে ও দুটো নিয়ে ওরা বাইরে আসে।

রু্য লাফায়েৎ-এর ছোট্ট হোটেলের ঘরে শুয়ে হেলেনের শরীরে শরীর মেলায় ল্যারী। এক বন্য আদিম বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে ওঠে দুটো উত্তেজিত শরীর। এক সময় সব উত্তেজনা শেষ হয়।

সকালে শহরে ঘুরতে বের হয় ল্যারী আর হেলেন। প্যারী শহরের গাইড হিসেবে ল্যারী এতোই ভালো যে শহরটাকে মজার একটা খেলনা মনে হয় হেলেনের। ল্যারী যেখানেই যায়, ওর বন্ধু জুটে যায়। ওর হাসি কেমন যেন সংক্রামক। ওর কাছ থেকেই যেন হাসতে শিখলো হেলেন। এই হাসি যেন ঈশ্বরের উপহার।

ল্যারী সম্বন্ধে হেলেনের মনে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জাগে। ল্যারীকে ভালোবেসে ফেলেছে ও। সে রাতে বাড়ি ফেরার পর পোষাক খুলে নগ্ন হয়ে হেলেনের পাশে শোয় ল্যারী। ওকে জড়িয়ে ধরে রাখে হেলেন। ওর ছোঁয়া, ওর পুরুষালী শরীরের গন্ধ হেলেনের ভালো লাগে।

বাবার কথা মনে পড়ে যায়, যে বাবা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বাবা এবং অগাস্তে লাঁশকে দেখে সেই মাপকাঠিতে সব পুরুষকে বিচার করে বোধ হয় ভুল করেছে হেলেন। ল্যারী ডগলাসের মত পুরুষও আছে। হেলেন পেইসের জীবনে ল্যারী ডগলাসের মত কেউ কখনও আসবেনা, সে জানে।

ল্যারী বলছে, 'প্রিন্সেস, তুমি কী জানো, সর্বকালের সেরা দুজন পুরুষ কে ছিল এই পৃথিবীতে?'

'তুমি!'

'না, উইলবার ও অরভিল রাইট। তারা মানুষকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দিয়েছিলো। তুমি কখনও প্লেনে চড়েছো?'

'নাতো!'

'আমি যখন বাচ্চা ছেলে, খুব ছোট, লং আইল্যাণ্ডের সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে দেখতাম, সমুদ্রের তরঙ্গ ছুঁয়ে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে সমুদ্র-শকুন। আমার হিংসে হতো। মনে হতো, আমিও যদি সমুদ্র-শকুনের মত, পাখীর মত,হাওয়ায় ভাসতে পারতাম...হাঁটতে শেখার আগে আমার হাওয়ায় উড়তে সাধ হয়েছিলো। আমার যখন নয় বছর বয়স, আমাকে পুরোনো এক বাইপ্লেনে চড়তে দিয়েছিলো আমাদের পরিবারের এক বন্ধু। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আমি পাইলটের ট্রেনিং নিতে শুরু করি।'

'তারপর...

'মহাযুদ্ধ বাধবে। বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। ফ্যাসিস্ত হিটলার ও নাৎসী জারমানী সারা পৃথিবীর মালিক হতে চায়।'

'ল্যারী, নাৎসী জার্মানীর সেনাবাহিনী কখনও ফ্রান্সে ঢুকতে পারবেনা। ফ্রান্স ও জার্মানীর মাঝখানে ফ্রান্সের যে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা রেখা, তাকে পেরিয়ে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি ওই লাইনটা একশোবার পার হয়েছি। হাওয়ায় উড়ে, বুঝেছো প্রিন্সেস, হ্যাঁ, প্লেন চালিয়ে। এই যুদ্ধ হবে আকাশযুদ্ধ·· আমার যুদ্ধ···'

রবিবার অলস দিন, বিশ্রামের দিন। মঁৎমারৎ-এর ছোট্ট খোলামেলা কাফেতে খোলা আকাশের নীচে ব্রেকফাষ্ট। তারপর হোটেলের ঘরে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা। শরীর নিয়ে খেলা। শরীর যে এত সুখ দিতে পারে, কেউ কখনও বলেনি হেলেনকে। শরীরে শরীর ছোঁয়ায় যখন ল্যারী, যখন দেহ নিয়ে খেলা করে প্রেমিক পুরুষ, তখন যেন একটা ম্যাজিক ঘটে যায়। চঞ্চল ল্যারী যখন ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অবিরাম কথা বলে, বিছানায় শুয়ে শোনে হেলেন। তার তখনও ভালো লাগে। তার বাবা তাকে প্রিন্সেস বলে ডাকতো। ল্যারীও তাকে ঠাট্টা করে প্রিন্সেস বলে ডাকে। ল্যারী যখন তার পাশে থাকে, নিজেকে তার সত্যিই প্রিন্সেস বলে মনে হয়। ল্যারীকে দেখে পুরুষ জাতটার উপরে নিজের বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে হেলেন। ল্যারীই তার পৃথিবী। হেলেন জানে, আর কিছু তার চাইনা, আর কাউকে সে কোনদিন চাইবেনা এবং ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয় যে ল্যারীও তাকে ভালোবাসে।

'ভেবেছিলাম বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হলে বিয়ে করবো না,' ল্যারী বলছে, এখন ভাবছি, প্ল্যান বদলানো দরকার, কী বলো প্রিন্সেস?'

হেলেন মাথা নাড়ে। সুখ যেন উথলে উঠেছে তার বুকের ভেতরে। এতো সুখ তার সইবে তো?

ল্যারী বলছে, 'গাঁয়ের দিকে যেয়ে কোন পাদ্রীর কাছে বিয়েটা সেরে এলে কেমন হয়? নাকি তুমি খুব জাঁকজমক করে শহরে বিয়ে করতে চাও?'

হেলেন মাথা নেড়ে বলে, 'গাঁয়ে যাওয়াই তো ভালো।'

'বেশ, তাই হবে। আজ রাতে আমাকে আমার স্কোয়াড্রনে ফিরে যেতে হবে। পরের শুক্রবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর বিয়ে। কেমন?'

'আমি, আমি এতোদিন তোমাকে ছেড়ে কিভাবে থাকবো?' হেলেনের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

'তুমি আমায় ভালোবাসো?' হেলেনকে জড়িয়ে ধরেছে ল্যারী।

'আমার জীবনের চেয়ে বেশী ভালোবাসি, সোজাসুজি কথাটা বলে হেলেন।'

দুঘণ্টা পর ল্যারী ফিরে চলেছে প্লেনে ইংল্যাণ্ডের দিকে। হেলেনকে গাড়ীতে এয়ারপোর্টে যেতে দেয়নি ল্যারী। বলেছে; 'বিদায় জানানো আমার ভালো লাগেনা।'

একগাদা টাকা ওর হাতে দিয়ে ল্যারী বলেছে, 'প্রিন্সেস, একটা ড্রেসিং গাউন কিনে রেখো। আগামী সপ্তাহে আমাদের বিয়ে।'

পরের সপ্তাহটা অদ্ভুত একটা সুখের ঘোরের মধ্যে কাটালো হেলেন। ল্যারীর সঙ্গে যেখানে যেখানে সে বেড়াতে গেছে, এখন সে একা সেইসব জায়গায় যায়। ল্যারীর কথা ভাবে, ভাবে আগামী দিনের দাম্পত্য জীবনের কথা। সুখস্বপ্নে দিন কাটতে চায়না। বড় দীর্ঘ দিন। কাঁটা

যেন নড়েনা। হেলেনের মনে হয়, তার মাথাটা যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বিয়ের পোষাক খুঁজতে এক ডজন দোকানে গেছে হেলেন। মাদেই-লীন ভিয়নেৎ-এর দোকানে ড্রেস তার পছন্দ হলো। সাদা অরগ্যানজা, উঁচু-গলা বডিস, লম্বা হাতায় মুক্তোর তৈরী দুটো বোতাম, ক্রিনোলিনের তিনটে পেটিকোট। যে দামে কেনা যাবে বলে ভেবেছিলো তার থেকে অনেক বেশী দাম। ল্যারীর দেওয়া টাকা নিজের জমানো টাকা সবই খরচ হয়ে গেল। এখন ল্যারীর কথা ছাড়া আর কোন কথা ভাবতে পারছে না হেলেন। ল্যারী কী করলে খুশি হবে, অতীতের কী ধরনের গল্প করলে মজা পাবে ল্যারী? নিজেকে স্কুলগার্লের মত মনে হয় এখন হেলেনের।

হেলেন প্রতীক্ষা করে, শুক্রবার কবে আসবে। দুঃসহ সেই প্রতীক্ষা।

শুক্রবার এলো। ভোরে উঠে স্নান করলো হেলেন। বারবার পোষাক বদলালো। কোন্ পোষাক পরলে খুশি হবে ল্যারী? বিয়ের আগে বিয়ের পোষাক পরলে নাকি দুর্ভাগ্য আসে। উত্তেজনায় উন্মাদের মত হয়ে গেছে হেলেন।

বেলা দশটার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হেলেন দেখলো, এতো সুন্দর আগে কখনো দেখায়নি তাকে। ল্যারী খুব খুশি হবে।

অথচ, দুপুর গড়িয়ে যায় ল্যারী আসেনা। ল্যারী তো বলে যায়নি, কখন ঠিক কটার সময় আসবে ল্যারী। ডেস্ক ক্লার্ককে বারবার ফোন করে হেলেন। কোন খবর আসেনি তো? ফোনটা খারাপ হয়নি তো?

সন্ধ্যে ছ'টা বাজে। তখনও আসেনি ল্যারী।

মধ্যরাত অবধি ল্যারী এলোনা। চেয়ারে বসে আছে হেলেন। ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রতীক্ষা করছে, কখন ল্যারীর ফোন

আসবে। শেষ পর্যন্ত ও ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙে, তখন ভোর হয়েছে। শনিবারের সকাল। তখনও আড়ষ্ট হিম শরীরে চেয়ারে বসে আছে হেলেন। অতো যত্নে বাছা পোষাকটা এখন কুঁচকে গেছে।

পোষাক বদলে সারা দিন খোলা জানলার সামনে বসে থাকে হেলেন। যেন, হেলেন ওখানে থাকলে ল্যারী আসবে। হেলেন জানালায় বসে না থাকলে ভয়ংকর কোন অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারে ল্যারীর।

সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তবে কী সত্যিই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে ল্যারীর? ভয়ংকর একটা ছবি যেন হেলেনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ল্যারীর প্লেন ভেঙে পড়েছে, হাসপাতালে বা মাঠে শুয়ে আছে আহত বা নিহত ল্যারী! সারাটা রাত ও জেগে বসে আছে। ঘর ছেড়ে যেতেও তার ভয় হয়। ল্যারীর সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে জানেনা। যখন রবিবার দুপুর অবধি খবর আসেনা, আর সহ্য হয়না ওর। ল্যারীকে ফোন করতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

যুদ্ধ চলছে।

ওভারসীজ কল বুক করা খুব ঝামেলা। তাছাড়া ল্যারী কোথায়?

ল্যারী ডগলাস বৃটিশ এয়ার ফোর্সের কোন এক আমেরিকান স্কোয়াড্রনের পাইলট। এইটুকুই শুধু জানে। টেলিফোন তুলে সুইচবোর্ড অপারেটরের সঙ্গে কথা বলে। অপারেটর বলে, 'অসম্ভব।' পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলে হেলেন। তার কথায় অথবা, তার গলার প্রচণ্ড হতাশার সুরে কী যেন ছিল। দু'ঘণ্টা পরে দেখা গেল, লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধদপ্তরের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে ও। যুদ্ধদপ্তর কোন খবর দিতে না পারলেও হোয়াইটহলের বিমানবাহিনী মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। তারা আবার যোগাযোগ করে দেয় কমব্যাট 'অপারেশনস'

দপ্তরের সঙ্গে। তারপর কানেকশন কেটে যায় ফোনের। দু'ঘণ্টা পরে আবার ফোনে কানেকশন পাওয়া যায়। তখন হেলেন প্রায় হিস্টিরিয়া গ্রস্ত। 'এয়ার অপারেশনস' দপ্তর কোন খবর দিতে পারেনা। বলে, 'আপনি বরং যুদ্ধদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'ওদের সঙ্গে কথা বলেছি।' ফোনেই ফুঁপিয়ে ওঠে হেলেন।

বৃটিশ ভদ্রলোক একটু অভিভূত হয়ে বলেন, 'মিস, অতো চিন্তা করবেন না, কোন খারাপ কিছু ঘটেনি বলেই মনে হয়। প্লীজ, ফোনটা একটু ধরুন।'

রিসিভার ধরে বসে আছে নিরাশ হেলেন, ল্যারী মরে গেছে। ল্যারী কিভাবে মরেছে, তাও তো কোনদিন জানতে পারবেনা।

অনেকক্ষণ পরে সেই বৃটিশ কণ্ঠস্বর খোশমেজাজে বলে, 'মিস, যাকে আপনি চাইছেন, সে বোধহয় আর, এ, এফ-এর আমেরিকান ইউনিট ইগল স্কোয়াড্রনে কাজ করে। যদিও কাজটা বেআইনী তবুও আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিচ্ছি ঈগল স্কোয়াড্রনের বিমানঘাঁটির। সেটা চার্চ ফেনটনে।'

রাত এগারোটায় ফোন আসে। নৈর্ব্যক্তিক এক কণ্ঠস্বর বলে, 'চারচ ফেনটন এয়ার বেস থেকে বলছি। কী বললেন, 'জোরে বলুন কিছু শোনা যাচ্ছেনা।'

আমি, কী বলবে হেলেন? ল্যারীর পদমর্যাটা কী? লেফটেন্যান্ট? ক্যাপ্টেন? মেজর? হেলেন তো তা জানে না।

'আমি ল্যারী ডগলাসকে খুঁজছি।'

'কী বললেন? কিছু শোনা যাচ্ছেনা মিস। জোরে বলুন, প্লীজ...'

তার মানে কী ল্যারী মরে গেছে! মৃত্যু সংবাদটাও গোপন করতে চাইছে ওরা! হেলেন চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি ল্যারী ডগলাসকে খুঁজছি। আমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।'

'লেফটেন্যান্ট ল্যারী ডগলাস? একটু ফোনটা ধরুন···হ্যাঁ, উইক-এণ্ডে ছুটিতে গেছেন লেফটেন্যান্ট ডগলাস। তার সঙ্গে কথা বলা যদি জরুরী হয় তবে লণ্ডনে ফোন করুন। সেখানে হোটেল স্যাভয়ের বলরুমে জেনারেল ডেভিসের পার্টি। পার্টিতে গেছেন লেফটেন্যান্ট ল্যারী ডগলাস।'

লাইনটা কেটে যায়। ক্লিনার হোটেলের ঘর পরিষ্কার করতে এসে দেখলো, মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রূপসী হেলেন। ওর কপাল ছুঁয়ে সে দেখলো জ্বরে হাত পুড়ে যাওয়ার জোগাড়। ঝি খবর দিলো হোটেলের পোর্টারকে। পোর্টার খবর দিলো হোটেলের ম্যানেজারকে। ম্যানেজার অ্যাম্বুলেন্স ডাকলো এক ঘণ্টা পরে। হোটেলের সামনে দাঁড়ালো একটা অ্যাম্বুলেন্স। ষ্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো হেলেনকে।

হাসপাতালে অক্সিজেন টেণ্টে রাখা হয়েছিলো হেলেন পেইসকে। চার দিন পরে ওর জ্ঞান ফিরলো। অচেতন অবস্থার কালচে-সবুজ গভীর থেকে যেন অনিচ্ছায় ফিরে আসে হেলেন। তার অবচেতন মন ভাবে, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটনা যা সে মনে রাখতে চায়না। অথচ মনের গভীর থেকে ভেসে উঠে কাছে আসে স্মৃতি, ল্যারী ডগলাসের স্মৃতি। হেলেন ফুঁপিয়ে কাঁদে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলে মনে হয়, কে যেন তার হাত ধরে আছে। কে? তাহলে সব ঠিক আছে। ফিরে এসো, ল্যারী ডগলাস। কতোদিন দেখিনি তোমায়!

কিন্তু চোখ খুলে সে দেখে, সাদা অ্যাপ্রন পরা অচেনা এক যুবক ডাক্তার তার মনিবন্ধের ধমনীর স্পন্দন গুণছে।

ডাক্তারের বয়স কম, মুখে বুদ্ধি ও শক্তির ছাপ, গভীর দুটো চোখের তারায় বাদামী রং।

'আমি কোথায় ?'

'সিটি হাসপাতালে।'

'এখানে আমি কী করছি ?'

'ভালো হয়ে উঠছো। ডবল নিউমেনিয়া হয়েছিলো। আমার নাম ইজরায়েল ক্যাৎজ।'

'তুমি ডাক্তার ?'

'ইনটার্ণ ট্রেনিং শেষ হলে পুরোপুরি ডাক্তার হবো। আমিই তোমায় এখানে এনেছি। তুমি সেরে উঠেছো বলে আনন্দিত। আমাদের বড় ভয় ছিলো

'আমি কদিন হাসপাতালে'

'চারদিন।'

'আমার একটা উপকার করবে, ডক্টর ?'

'চেষ্টা করে দেখবো।'

'হোটেল লাফায়েৎ-এ ফোন করে দেখ, আমার কোন চিঠি, টেলিগ্রাম, ফোন, কিছু এসেছে কিনা। আমার ফিঁয়াসে হয়তো আমায় খুঁজছে।'

'আমি দেখছি। তুমি ঘুমোও।'

'না, খবরটা না জানলে আমি ঘুমোতে পারবনা।'

দুঘণ্টা পরে ফিরে ইনটার্ণ ইজরায়েল ক্যাৎজ দেখলো, তখনো জেগে আছে হেলেন।

তোমার সুটকেস, কাপড়জামা সব হোটেল থেকে নিয়ে এলাম। আমি নিজেই হোটেলে গিয়েছিলাম। আমি দুঃখিত, 'কেউ তোমার খোঁজ নেয়নি।'

দীর্ঘ সময় একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায় হেলেন। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

দুদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল হেলেন। ইজরায়েল কাৎজ বিদায় জানাতে এসে বলে, 'তুমি কোথায় যাবে? কোন চাকরী করো তুমি?'

'না'।

'কী কাজ করতে পারো?'

'মডেলের কাজ করেছি।'

'আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি।'

'কারো সাহায্যের দরকার নেই আমার।'

'এই কাগজে ঠিকানাটা লেখা রইলো। ছোট্ট ফ্যাশন হাউস আমার পিসী এর মালিক। ওঁকে বলে দেবো। মত বদলালে দেখা করতে পারো। টাকাপয়সা আছে সঙ্গে?'

কোন উত্তর দিলোনা হেলেন।

কয়েকটা ফ্রাঁ ওর হাতে দিয়ে যুবক ইনটারণী জানায়, 'বেশী দিতে পারলামনা বলে দুঃখিত। ইনটারণীর মাইনে বড্ড কম।'

'ধন্যবাদ' হেলেন বলে।

রাস্তার ধারে ছোট্ট কাফেতে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে হেলেন ভাবে, কিভাবে সে জীবনের ছেঁড়া সুতোগুলো আবার জোড়া দেবে। তাকে বাঁচতেই হবে। কেননা এখন তার বাঁচার একটাই অর্থ, একটাই উদ্দেশ্য!

প্রতিশোধ নেওয়া। এমন প্রচণ্ড ও জলন্ত এক ঘৃণা ও বিদ্বেষ তার মনের আড়ালে যে সেখানে অন্য কোনোরকমের কোনো অনুভূতির এখন আর এতটুকু স্থান নেই। ল্যারী ডগলাস তার মনের গহনে যেসব অনুভূতি জাগিয়ে আবার সেইসব অনুভূতিকে হত্যা করেছে, তার ভস্মশেষ থেকে উপকথার ফিনিক্স পাখীর মত আজ জেগে উঠেছে প্রতিশোধ স্পৃহা। ল্যারী ডগলাসের এই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেবে হেলেন। একদিন ওর সময় আসবে। সেদিন এই ল্যারী ডগলাসকে ধ্বংস করবে হেলেন। কিভাবে, কেমন করে, কবে—সে জানেনা। সে শুধু জানে, একদিন তারও দিন আসবে।

এখন তার দরকার মাথা গোঁজার ঠাঁই। দরকার একটা চাকরীর। কাগজে একটা ঠিকানা লিখে দিয়েছে ডাক্তার। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার ইজরায়েল কাৎজের পিসীর সঙ্গে দেখা করলো হেলেন। ভদ্রমহিলা রু্য ব্যুসলৎ-এ ছোটখাট এক ফ্যাশন হাউসের মালকিন। তার মুখটা ডাইনীর মত মনটা খুব নরম। ফ্যাশন হাউসের মডেল মেয়েদের সে নিজের মেয়ের মত দেখে, মেয়েরা তাকে মায়ের মত ভালোবাসে। মাদাম রোজ হেলেনকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে দিয়ে সালোঁর কাছেই ছোট্ট এক ফ্ল্যাটে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। সুটকেস খুলে বিয়ের পোষাক হিসেবে কেনা সুন্দর গাউনটা ক্লোজেটের সামনের দিকে টাঙালো হেলেন, যাতে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ও রাতে শুতে যাবার সময় ওটা তার নজড়ে পড়ে।

শরীরে কোন চিহ্ন স্পষ্ট হওয়ার আগে, ডাক্তার পরীক্ষা করার আগে এবং মাসিক বন্ধ হবার আগেই হেলেন জেনে গেল, তার গর্ভে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটেছে। তার জঠরে বেড়ে উঠেছে আগামী নব জাতকের

ভ্রূণ। রাতে বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে সেকথা ভাবতে ভাবতে জান্তব এক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হেলেনের চোখ দুটো।

প্রথম ছুটির দিনেই ইজরায়েল কাৎজ্‌কে ফোন করে লাঞ্চের অ্যাপয়েন্টমেন্ট যোগার করে হেলেন পেইস। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হতেই সে জানায়, 'আমি গর্ভবতী।'

'কোন টেস্ট হয়েছে? অনেক মেয়ে অনেক সময় এব্যাপারে ভুল করে। ক'মাস হয়নি?'

'আমার কোন টেস্টের দরকার নেই। আমি তোমার সাহায্য চাই।'

'গর্ভপাত? সন্তানের জনক কী বলে? সেও তাই চায়?'

'সে এখানে নেই।'

'তুমি তো জানো, গর্ভপাত এদেশে বে-আইনী। তোমাকে সাহায্য করতে গেলে আমার বিপদ হতে পারে।'

'তুমি কী দাম চাও?'

রাগে শক্ত হয়ে ওঠে ডাক্তারের মুখ। 'হেলেন, তোমার কী ধারণা যে সবকিছুই দাম দিয়ে পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, সবকিছুই কেনাবেচা হয়।'

'তুমি নিজেও কী পণ্য?'

'হ্যা, তবে আমার দাম খুব বেশী। এতো কথার দরকার নেই, আমায় সাহায্য করবে?'

'আগে টেস্ট হোক', বলল ডাক্তার।

পরের সপ্তাহে ল্যাবোরেটরী টেস্টের রিপোর্ট পেয়ে ডাক্তার ফোন করে, 'ঠিকই বলেছিলে। তুমি গর্ভবতী।'

'আমি জানতাম।'

,হাসপাতালেই ডি অ্যাণ্ড ই অপারেশন হবে। আমি ওদের বলে দেব তোমার স্বামী অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যাওয়ায় এখন তুমি মা হতে চাওনা। পরের শনিবার অপারেশন হবে।'

'না।'

'কেন? শনিবার দিনটা খারাপ তাই?'

'না ইজরায়েল, এখনই অপারেশন চাইনা আমি। তোমার ওপর নির্ভর করা যায় কিনা, তাই জানতে চেয়েছিলাম।'

হেলেনের মধ্যে আশ্চর্য এক পরিবর্তন ফ্যাশন হাউসের মালিক মাদাম রোজের চোখ এড়ায়না। অদ্ভুত এক ঔজ্জ্বল্য। আশ্চর্য এক দীপ্তি মুখে, সবসময় রহস্যময় হাসি।

'তুমি কী কোনো প্রেমিক পুরুষ খুঁজে পেয়েছো?' মাদাম রোজ জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'তোমার ভাগ্য ভালো। ওকে ছেড়োনা।'

'কোনোদিন ছাড়বোনা, মাদাম।'

তিন সপ্তাহ পরে ইজরায়েল কাৎজের ফোন আসে। 'অনেকদিন তোমার কোনো খবর নেই। ব্যাপারটার কথা ভুলে গেলে নাকি?'

'না, ভুলিনি, সবসময় ওকথাই ভাবি।'

'কেমন আছ এখন?'

'খুব ভালো।'

'ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাও। অপারেশনটা এখনই করা ভালো।'

'না, আমি এখনও তৈরী হইনি।'

ভ্রূণ। রাতে বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে সেকথা ভাবতে ভাবতে জান্তব এক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হেলেনের চোখ দুটো।

প্রথম ছুটির দিনেই ইজরায়েল কাৎজ্‌কে ফোন করে লাঞ্চের অ্যাপয়েন্টমেন্ট যোগার করে হেলেন পেইস। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হতেই সে জানায়, 'আমি গর্ভবতী।'

'কোন টেস্ট হয়েছে? অনেক মেয়ে অনেক সময় এব্যাপারে ভুল করে। ক'মাস হয়নি?'

'আমার কোন টেস্টের দরকার নেই। আমি তোমার সাহায্য চাই।'

'গর্ভপাত? সন্তানের জনক কী বলে? সেও তাই চায়?'

'সে এখানে নেই।'

'তুমি তো জানো, গর্ভপাত এদেশে বে-আইনী। তোমাকে সাহায্য করতে গেলে আমার বিপদ হতে পারে।'

'তুমি কী দাম চাও?'

রাগে শক্ত হয়ে ওঠে ডাক্তারের মুখ। 'হেলেন, তোমার কী ধারণা যে সবকিছুই দাম দিয়ে পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, সবকিছুই কেনাবেচা হয়।'

'তুমি নিজেও কী পণ্য?'

'হ্যা, তবে আমার দাম খুব বেশী। এতো কথার দরকার নেই, আমায় সাহায্য করবে?'

'আগে টেস্ট হোক', বলল ডাক্তার।

পরের সপ্তাহে ল্যাবোরেটরী টেস্টের রিপোর্ট পেয়ে ডাক্তার ফোন করে, 'ঠিকই বলেছিলে। তুমি গর্ভবতী।'

'আমি জানতাম।'

,হাসপাতালেই ডি অ্যাণ্ড ই অপারেশন হবে। আমি ওদের বলে দেব তোমার স্বামী অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যাওয়ায় এখন তুমি মা হতে চাওনা। পরের শনিবার অপারেশন হবে।'

'না।'

'কেন? শনিবার দিনটা খারাপ তাই?'

'না ইজরায়েল, এখনই অপারেশন চাইনা আমি। তোমার ওপর নির্ভর করা যায় কিনা, তাই জানতে চেয়েছিলাম।'

হেলেনের মধ্যে আশ্চর্য এক পরিবর্তন ফ্যাশন হাউসের মালিক মাদাম রোজের চোখ এড়ায়না। অদ্ভুত এক ঔজ্জ্বল্য। আশ্চর্য এক দীপ্তি মুখে, সবসময় রহস্যময় হাসি।

'তুমি কী কোনো প্রেমিক পুরুষ খুঁজে পেয়েছো?' মাদাম রোজ জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'তোমার ভাগ্য ভালো। ওকে ছেড়োনা।'

'কোনোদিন ছাড়বোনা, মাদাম।'

তিন সপ্তাহ পরে ইজরায়েল কাৎজের ফোন আসে। 'অনেকদিন তোমার কোনো খবর নেই। ব্যাপারটার কথা ভুলে গেলে নাকি?'

'না, ভুলিনি, সবসময় ওকথাই ভাবি।'

'কেমন আছ এখন?'

'খুব ভালো।'

'ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাও। অপারেশনটা এখনই করা ভালো।'

'না, আমি এখনও তৈরী হইনি।'

তিন সপ্তাহ পরে হেলেনকে র‍্যু দ্য শাৎ কী পেইশ-এর সস্তা এক কাফেতে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালো ডাক্তার। ভালো কোনো রেস্তোরার নাম বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল হেলেন। তার মনে পড়লো, ডাক্তার বলেছিলো ট্রেনিং-এর সময় ইনটারণীর ডাক্তাররা বড্ড কম মাইনে পায়। ডিনারের পর কফি খেতে খেতে ডাক্তার বলে,

'হেলেন তুমি তো এখন গর্ভপাতই চাও?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

'তাহলে? দুমাস হয়ে গেল। এখন অপারেশন না করলে···

'না, এখনই না, ইজরায়েল।'

'এই তো তোমার প্রথম গর্ভবতী হওয়ার অভিজ্ঞতা, তাই না? শোন, হেলেন, তিন মাস অবধি, খুব ছোট অপারেশনই তখন গর্ভপাতের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু, তার পরে অর্থাৎ পেটের বাচ্চাটা বড় হয়ে গেলে বড় অপারেশনের দরকার হয়। তখন ঝামেলাও বেশী হয়। তাই আমি চাইছি যে, তুমি যখন গর্ভপাতই চাইছো, তখন অপারেশনটা এখনই হয়ে যাক।'

'আমার পেটের বাচ্চাটা এখন দেখতে কেমন, ডাক্তার?'

'এখন? কয়েকটা কোষ। পরে যা পূর্ণ মানবদেহের রূপ নেবে।'

'আর তিন মাস হয়ে গেলে?'

'তখন সে পূর্ণাবয়ব এক মানবশিশু।'

'তার অনুভূতি আছে?'

'জোরে শব্দ হলে, জোরে ঘা দিলে...'

'সে ব্যথা পায় তখন?'

'হয়তো। তবে অ্যামনিয়টিক স্যাকে ঢাকা থাকে সে,ব্যথা পাওয়া শক্ত'

চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে চেয়ে আছে হেলেন।

ডাক্তার একটু ভেবে লাজুকের মত বলে, হেলেন, তুমি যদি গর্ভপাত না চাও, তুমি যদি সন্তানের মা হতেই চাও, অথচ হয়তো সন্তানের পিতা তোমায় ছেড়ে গেছে বলে ভয় পাচ্ছো। তুমি চাইলে আমি তোমায় বিয়ে করে তোমার সন্তানের পিতৃ-পরিচয় দিতে পারি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে হেলেন বলে, 'ডাক্তার, আমি তো আগেই তোমায় বলেছি, আমি মা হতে চাইনা, আমি গর্ভপাতই চাইছি।'

'তাহলে যীশুর দোহাই, অপারেশন এখনই করাও,' ইজরায়েল চেঁচিয়ে ওঠে। রেস্তোরাঁর অন্য সবাই ওদের দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে পেরে সে সংযত করল নিজেকে।

'হেলেন, গর্ভপাতের ব্যাপারে আর দেরী করলে ফ্রান্সের কোনো ডাক্তার অপারেশন করতে রাজী হবে না। দেরীতে গর্ভপাত করাতে যেয়ে মরে যেতে পারো।'

'বুঝেছি। ডাক্তার, ধরো, আমি চাই, বাচ্চাটা বাঁচুক···সে ক্ষেত্রে কী খাবার আমার খাওয়া উচিত?'

নিজের মাথার চুলের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে ডাক্তার ঘাবড়ে যেয়ে বিহ্বলভাবে বলে, 'দুধ, ফল, চর্বি ছাড়া মাংস।'

দশ দিন পরে মাদাম রোজের অফিসে গেল হেলেন, তাকে জানালো, সে গর্ভবতী, ছুটি চায়। মাদাম রোজ ছুটি দিয়ে দিলো একটুও দ্বিধা না করে।

পরবর্তী চার সপ্তাহে বাজার করা ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে দেখা গেলনা হেলেনকে।

তার ক্ষিধে পায়না। তবুও বাচ্চা বড় হবে বলে যত বেশি সম্ভব দুধ ও ফল খায়।

এখন এই ফ্ল্যাটে হেলেন একা নয়। তার সঙ্গে আছে অজাত এক মানবশিশু। তারই সঙ্গে অনর্গল অবিরাম কথা বলছে ও, 'খোকন, তুমি বড় হও, শক্তসমর্থ হও। মারা যাওয়ার সময় যেন তুমি খুব লড়তে পারো।'

এইভাবে অজাত শিশুর বিশ্বাসঘাতক জনক লেফটেন্যান্ট ল্যারী ডগলাসের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে হেলেন। ওর গর্ভে যে ভ্রূণ গড়ে উঠেছে, সে তো হেলেনের কেউ নয়। সে ওই বিশ্বাসঘাতক অমানুষ ল্যারী ডগলাসের সন্তান। ল্যারী ডগলাস যে আমানত রেখে গেছে তার কাছে। আর কিছু তো তাকে দেয়নি ল্যারী, ল্যারী যেমন তার সর্বনাশ করেছে তেমনি ল্যারীর সন্তানকে হত্যা করে প্রথম প্রতিশোধ নেবে হেলেন পেইস।

এসব কিছুই বোঝেনি ডাক্তার ইজরায়েল কাৎজ। কয়েকটা জীবকোষের সম্মিলন, দুমাসের ভ্রূণকে খুন করায় আনন্দ নেই। ওই শিশু বড় হোক তখন ওকে মারলে ও যন্ত্রণা পাবে, যেমন যন্ত্রণা ল্যারী দিয়েছে হেলেনকে। এখনও বিছানার কাছেই ঝুলছে বিয়ের জন্য কেনা সেই দামী গাউনটা মনে করিয়ে দিচ্ছে ল্যারী ডগলাসের বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

প্রথমে সে ল্যারীর সন্তানকে হত্যা করবে।

তারপর···একদিন—যখন তার দিন আসবে—চূড়ান্ত যন্ত্রণা দিয়ে সে হত্যা করবে ল্যারীকে।

ফোন বাজে।

হেলেন জানে, ডাক্তার ইজরায়েল কাৎজ ফোন করছে। ফোন ধরেনা।

একদিন সন্ধ্যায় দরজার কাঠে ঘুষির পর ঘুষি। বাধ্য হয়ে দরজা খোলে হেলেন। ইজরায়েল কাৎজ দাঁড়িয়ে আছে।

'মাই গড, আমি রোজ তোমায় ফোন করছি—আমি তো ভাবলাম—অন্য কোথাও অপারেশন করিয়েছ।'

'না ডক্টর, অপারেশন তুমিই করবে।'

'আমি তোমায় এতো করে বোঝালাম, তুমি কিছুই বোঝনি। এখন গর্ভপাতের অপারেশন খুবই বিপজ্জনক হবে। কোনো ডাক্তার রাজী হবেনা। তুমি দুধ খাচ্ছো, ফল খাচ্ছো। তার মানে? তুমি তাহলে মা হতে চাও?'

'বলো তো ডাক্তার, আমার পেটের বাচ্চাটা এখন কেমন দেখতে? তার চোখ আছে? কান আছে? তার হাত পায়ে আঙ্গুল আছে? সে ব্যথা পায়?'

'থামো, হেলেন, খৃস্টের দোহাই, থামো। তুমি কী চাও, আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।'

'না তুমি বুঝবেনা, ডাক্তার।' হেলেনের মুখে রহস্যময় হাসি।

আরও তিন সপ্তাহ পরে ভোর চারটের সময় ইনটারণী ইজরায়েল কাৎজ-এর ফোন আসে।

'ইজরায়েল?' ফোনের অন্যপ্রান্তে গলাটা কার ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা।

'ইয়েস?'

'এখন সময় হয়েছে। এসো, ইজরায়েল!'

'হেলেন?'

'এখনই—'

খৃস্টের দোহাই ! বড্ড দেরী হয়ে গেছে, হেলেন ? আমি পারবোনা' কিছুতেই পারবোনা। তুমি মরে যাবে। কাজটা বে-আইনী। আমি ঝামেলায় পড়বো। তুমি বরং হাসপাতালে যাও।'

ক্লিক করে একটা শব্দ। ফোন রেখে দিয়েছে হেলেন। ফোন রেখে ঘরে ফিরে আসে ইজরায়েল। ভাবে অসম্ভব ! গর্ভপাতের চেষ্টা বিপজ্জনক। হেলেন মরে যাবে। না, এ কাজ পারবেনা ইজরায়েল।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পোষাক পরছে ইজরায়েল। ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে আসছে।

ইজরায়েল কাৎজ হেলেন পেইসের ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখে রক্তের বন্যায় শুয়ে আছে হেলেন। মুখটা ফ্যাকাসে, মরা মানুষের মত। পরণের বিয়ের গাউন রক্তে ভেজা। পাশে তারের হ্যাঙ্গারে একটা কোট ঝোলানো। ওটাও রক্ত মাখা।

'জেসাস ক্রাইস্ট।'

ক্রমাগত রক্তস্রাব হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে বলে উঠে দাঁড়ায় ডাক্তার।

'ডাক্তার, ল্যারীর বাচ্চাটা মরে গেছে'—হেসে বলে হেলেন।

সেপ্‌টিক অ্যাবরশন, জরায়ু ফুটো হয়েছে। ব্লাড পয়জনিং এবং শক। দুজন ডাক্তার পাঁচ ঘণ্টা ধরে লড়লো। হেলেন বাঁচবেনা ওরা ভেবেছিলো অথচ সন্ধ্যে ছটা নাগাদ বোঝা গেল, বিপদ কেটে গেছে। দুদিন পরে যখন সে বিছানায় বসে আছে তার সঙ্গে দেখা করতে এলো ইজরায়েল।

'সবাই বলছে, তোমার বেঁচে থাকা এক অলৌকিক ব্যাপার।' ইজরায়েল বলে। হেলেন মাথা নাড়ে। ও বুঝতে পারলো, ডাক্তার কিছু বোঝেনি। এখন কি ওর মরার সময় ? এই তো শুরু। ল্যারীর সন্তানকে সে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে। এবার—ল্যারীর উপর প্রতিশোধ নিতে হবে। হেলেনের দিন আসবেই।

তার আগে ল্যারীকে খুঁজে বের করতে হবে।

চার

শিকাগো, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০। ইউরোপে যখন মহাযুদ্ধের ঝড় বইতে শুরু করেছে, অতলান্তিক মহাসমুদ্রের ওপরে তখন মৃদু হাওয়া।

নরওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে, জার্মানীর বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ-ঘোষণা করতে দেরী করছেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে ছাত্রবিক্ষোভ আর আর্মড ফোরসে কিছু সিনিয়র ছাত্রের যোগদান ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ঘটলোনা।

'রুস্ট' রেস্তোরাঁয় ক্যাশিয়ারের চাকরী করে ইউনিভার্সিটির খরচার কিছুটা চালায় ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডার। বাকীটা আসে স্কলারশিপের টাকা থেকে।

যুদ্ধ তার জীবন বদলাবে কিনা, ক্যাথরিন জানেনা। কিন্তু আরও একটা কথা সে জানতে চায়। পুরুষের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে কেমন লাগে মেয়েমানুষদের? পুরুষের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের সময় কেমন লাগে মেয়েদের? ক্যাথরিন কী হারাচ্ছে, সে জানে। এখন যদি হঠাৎ গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে মারা যায় ক্যাথরিন আলোকজাণ্ডার, সবাই তো জানবে যে, ক্যাথরিন কুমারী ছিল। সে কোন পুরুষের সঙ্গে কোনোদিন শোয়নি। সর্বনাশ! এখনই পুরুষের সঙ্গে শোয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাকে।

রেস্তোরাঁয় রন পিটারসন জীন অ্যান নামের সেই বান্ধবীকে বলছে, 'কী খাওয়া যায়? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।'

'এটা কেমন পরখ করে দেখো...'

আচমকা ক্যাথরিন ওর হাতে ভাজ করা এক কাগজের টুকরো তুলে দিয়ে ক্যাশ রেজিস্টারের কাছে ফিরে যায়। কাগজটা খুলে পড়ে জোরে হেসে উঠে ওটা পকেটে রাখে রন পিটারসন।

ওর গার্লফ্রেণ্ড বলে 'কী লিখেছে বললেন?'

'প্রাইভেট জোক।'

রন গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে যাবার সময় আড়চোখে তাকালো ক্যাথরিনের দিকে।

কাজ সেরে রেস্তোরাঁ থেকে বের হয় ক্যাথরিন। শরতের সন্ধ্যা। ওদের বুক ছুঁয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আকাশের রঙ বেগুনি আর ভেলভেট মেশানো। দূরে তারা দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যাটা আদর্শ। কিন্তু কিসের জন্যে আদর্শ?

ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে এগিয়ে এসে রন পিটারসন বলে, 'হাই, ক্যাথি, কোথায় যাচ্ছ?'

এখন খুব নার্ভাস লাগছে ক্যাথির। 'বিশেষ কোথাও নয়।'

'ডিনার খাবে? চাইনিজ খাবার তোমার পছন্দ?'

'খুউব, 'আবদারের কণ্ঠে বলে ক্যাথি।'

...লিন ফং-এর রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক।'

নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে, যে রাতে তুমি তোমার কৌমার্য হারালে সে রাতে তুমি কী করেছিলে, ক্যাথি? লিং ফং-এর রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম, চাইনিজ খাবার যৌন উত্তেজনা বাড়ায়, তাই। ছি, ছি! তার থেকে যদি হেনরিথির রেস্তোরাঁয় যেতে চাইতো ক্যাথি, রন হয়তো ভাবতো এই মেয়েকে বিয়ে করা যায়।

'ক্যাথি, আমি তো ভেবেছিলাম, পুরুষের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ নেই।' বললো রন।

অর্থাৎ, ও বলতে চাইছে, ওর ধারণা ছিলো, আমি সমকামিতায় অভ্যস্ত? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। বাবাকে লুকিয়ে অনেক পর্ণোগ্রাফি পড়েছে ক্যাথরিন। সে জানে, রন যখন প্রথম তার কৌমার্য হরণ করবে, তার ব্যাথা লাগবে। কিন্তু, তা সে জানতে দেবেনা রনকে। সে সঙ্গমের সময় নিতম্ব দোলাবে, ওসময় চুপ চাপ থাকলে পুরুষেরা নাকি পছন্দ করে না। এবং রনের ওই জিনিষটা যখন তার ভেতরে ঢুকবে, ব্যথা ঢাকতে একটা চিৎকার ধ্বনি করবে ক্যাথরিন। ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডার নয়, একটা সেক্স মেশিন। যেমন মারলিন দিয়েত্রিচ, যেমন ছিলো ক্লিওপেট্রা।

'ক্ষিধে থাকে তো রেস্তোরাঁর ক্যাশিয়ারকে খেতে পারো,' ক্যাথরিনের লেখা কাগজটা সামনে মেলে ধরে হাসছে রন।

'রসিকতাটা আমার পছন্দ।'

ক্যাথরিন বলে, 'পৃথিবীতে যেসব যুবতী এখনো কৌমার্য হারায়নি, তাদের জন্যে আমি দুঃখিত।'

তাদের স্বাস্থ্যপান করে রন। রনের জন্য হুইস্কি—সোডা। ক্যাথরিন অর্ডার দিয়েছে চেরীফল। চেরীফল পর্ণো-সাহিত্যে এবং মুখখিস্তিতে সতীচ্ছেদের প্রতীক। খুকী, তোমার চেরীফল কোথায় হারালে? অর্থাৎ—খুকী তোমার কৌমার্য কোথায় হারালে? ইঙ্গিতটা বড্ড বেশী স্পষ্ট হয়ে গেলো যে!

ছ'কোর্সের ডিনারের অর্ডার দিয়েছে রন। ভেতরে ভেতরে ক্যাথরিন এতো নার্ভাস, সে কাগজ চিবোচ্ছে না খাবার খাচ্ছে, সে জানে না।

'আর কিছু?' রন জিজ্ঞেস করে।

'না।'

'চলো, যাওয়া যাক। কোন্ হোটেল তোমার পছন্দ?'

'সবাই তো একরকম।'

'ও, কে। চলো, যাই।'

গাড়ী চলেছে ক্লার্ক স্ট্রীট দিয়ে। ইজি রেস্ট, ওভারনাইট, কাম ইনট্র্যা-ভেলার্স রেস্ট। ওখানে, ওইসব রাত্রাবাসে তখন যুবক যুবতীরা সংগমে ব্যস্ত, ক্যাথরিন ভাবে। শুধু ক্যাথরিন তখনও কুমারী।

'প্যারাডাইস ইন। এটাই সব থেকে ভালো।' রন বলে।

ভেতরে দু'ডজন কাঠের তৈরী বাংলো।

'কেমন?' ভেতরে ঢুকে রন জানতে চায়।

ক্যাথরিন ভাবে, কবি দান্তের কল্পনার নরক ইনফার্ণোর মত। রোমার কলোসীয়ম, যেখানে খৃস্টানদের সিংহের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হতো, সেখান-কার মত। ডেলফির সেই মন্দিরের মত, যেখানে কুমারীদের কৌমার্য হরণ করা হতো। মুখে বলে, 'দারুণ; সত্যিই দারুণ।'

ক্যাথরিনের উরুতে মৃদু চাপ দিয়ে প্যারাডাইস ইনের দিকে যেতে যেতে রন বলে, 'এখুনি আসছি।' বলে রন কোথায় চলে যায়! আবার ফিরে আসে ঝট করে।

দূরে পুলিশের সাইরেন বাজছে। এইসব নৈশ আবাসে রাতে যুবক-যুবতীদের অশ্লীল লীলাখেলা চলে বলে পুলিশ মাঝে মাঝে হানা দেয়। রনের হাতে একটা ঘরের চাবি। বাংলোর নম্বর ১৩। এই সংখ্যাটি নাকি আন লাকি। অর্থাৎ, এখানে রন পিটারসনের সঙ্গে যৌনমিলনের ফলে গর্ভবতী হবে ক্যাথি এবং এভাবেই ঈশ্বর শাস্তি দেবেন সেণ্ট ক্যাথরিনকে। ঘরটায় মস্ত বড় খাট বিছানা ছাড়া আছে শুধু আয়না

সমেত ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল, বিচ্ছিরি এক ইজিচেয়ার এবং ভাঙাচোরা একটা রেডিও। এখানে ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে আসে শুধুমাত্র যৌন-সংগমের উদ্দেশ্যে। রন এখন দরজা বন্ধ করছে, খিল লাগাচ্ছে। অর্থাৎ আজ রাতে পুলিশের ভাইস স্কোয়াড এখানে হানা দিলে এই ঘরে পুলিশকে দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে। উলঙ্গ ক্যাথরিনকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন পুলিশ, ফটো তুলছে শিকাগো ডেইলি নিউজের ফটোগ্রাফার, মনে মনে কল্পনা করে ক্যাথি।

'ক্যাথি, তোমার কী নার্ভাস লাগছে?' জিজ্ঞেস করে রন।

'নার্ভাস? বোকার মত কথা বোলোনা।' ঝাঁপিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে ক্যাথি।

'ক্যাথি, তুমি আগে কখনো পুরুষের সঙ্গে শুয়েছোতো?'

'কতবার শুয়েছি, লিখে রাখিনি। কতজনের সঙ্গে শুয়েছি, তারও স্কোরকার্ড নেই।'

'তোমাকে আমার কখনোও মনে হয় সেক্সি কখনো বা শীতল।'

'দেখবে?'

ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গিয়ে ওর মুখে ডিমের গন্ধ পায় ক্যাথরিন, ওর স্তনে হাত বোলাচ্ছে রন, ওর মুখের ভেতরে তার জিভ। ক্যাথরিনের গোপন ত্রিকোণের আড়ালে কামনার মধু ঝরে যায়।

'তুমি পোষাক খোলো। আমি দেখবো', রন বলে।

আস্তে আস্তে চেন খুলে পোষাক খোলে ক্যাথরিন। ভেতরে ব্রা, প্যান্টি। বিছানায় বসে জুতো মোজা খুলছে ক্যাথি।

পেছন থেকে তার ব্রার হুক খুলে দেয় রন, তারপর ক্যাথরিনকে দাঁড় করিয়ে তার প্যান্টি টেনে নিচে নামায়। প্যান্টিটা মেঝেতে খসে পড়লে চোখ খোলে ক্যাথি।

রন একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত বলে উঠলো, 'মাই গড, ক্যাথি, তুমি সত্যিই সুন্দরী!'

রন নিচু হয়ে চুমু খেলো ক্যাথির স্তনে। নিজের শার্ট, টাই, বেল্ট, প্যান্ট, শর্টস, জুতো, মোজা খুলছে।

ক্যাথি ভাবছে, আয়নায় সবকিছু ফরাসী ব্যঙ্গরসাত্মক নাটকের পরিবেশের মতন। কিন্তু আমার গোপন ত্রিকোণ কামনার তপ্ত ধারা বলে দিচ্ছে, এথেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই।

আবেগভরা গলায় রন বলছে, 'সত্যি বলছি, ক্যাথরিন, তোমার মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি।'

ক্যাথরিনের আতংক এই কথায় যেন আরো বাড়ে। রন দাঁড়িয়ে আছে। উলঙ্গ, অধীর, মুখে প্রত্যাশার হাসি। তার শর্টস মেঝেয় খসে যায়।

রনের পুরুষাঙ্গটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের ওই জিনিষটা জীবনে কখনো দেখেনি ক্যাথি।

নিজের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে রন বলে, 'পছন্দ তো?'

ক্যাথরিন না ভেবেই বলে, 'কুচি কুচি করে, রাই, সর্ষে আর লেটুস দিয়ে···' এবং ক্যাথরিন দাঁড়িয়েই থাকে।

রনের উত্থিত লিঙ্গ ওর চোখের সামনে নিচে নেমে যায়!! কৌমার্য হারানোর অভিজ্ঞতা লাভ কপালে নেই ক্যাথির।

ক্যাথরিন যখন ইউনিভার্সিটির উঁচু ক্লাসে উঠলো, ততোদিনে ক্যামপাসের আবহাওয়া বদলে গেছে।

ইউরোপে যা ঘটছে, এই প্রথম তাই নিয়ে এখানে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে এবং আমেরিকা এই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এমন এক সম্ভাবনা এবার উঁকি দিচ্ছে আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের মনে। ফ্যাসিস্ত হিটলার যে তার নাৎসী জার্মানীর হাজার বছর ব্যাপী স্বৈরাচারী বাসনা পৃথিবীর বুকে বন্দুকের জোরে কায়েম করতে চায়, একথা মানুষ বুঝতে পারছে। নাৎসীরা ডেনমার্ক অধিকার করেছে এবং নরওয়ে আক্রমণ করেছে।

সুতরাং, সেক্স বা পোষাকের বদলে ছাত্রছাত্রীদের আলোচনার বিষয়-বস্তু এখন যুদ্ধ। কলেজের ছাত্ররা আর্মি বা নেভিতে নাম লেখাচ্ছে। ক্যাথরিনের ক্লাসমেট সুসি রবার্টস যাচ্ছে ওয়াশিংটনে।

'ওখানে একটা মেয়ের জায়গায় একশোটা পুরুষ। এখানকার মত কমপিটিশন নেই। তুমিও চলোনা—,

বাবাকে ফোন করে ক্যাথি জানালো, সে ওয়াশিংটনে যাচ্ছে।

পাঁচ

প্যারী, ১৯৪০-এর ১৪ই জুন। নাৎসী জার্মান পঞ্চম বাহিনী স্তম্ভিত প্যারী নগরীর ভেতরে মার্চ করে ঢুকলো। ফ্রান্স ও জার্মানীর মাঝে কাল্পনিক যে প্রতিরক্ষারেখা এবং দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষাক্ষেত্র সম্বন্ধে ফরাসীদের অতো গর্ব, তা ভেঙ্গে পড়লো তাসের ঘরের মত। যুদ্ধের ইতিহাসে প্রচণ্ড এক বিপর্যয়। যার ফলে পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তিমান মিলিটারী যন্ত্রের সামনে ফ্রান্সের আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই রইলো না।

দিনের শুরুতে শহরের বুকে দেখা গেল অদ্ভুত এক ধূসর ছায়া। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় কামানের গোলাবর্ষণে মাঝে মাঝে আতঙ্কিত প্যারী নগরীর অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ ভেঙেছে। কামানের গর্জন শহরের বাইরে। প্রতিধ্বনিত হয় প্যারীর হৃদয়ে। রেডিওয়, সংবাদপত্রে, মুখে মুখে ছড়িয়েছে অদ্ভুত সব গুজব। ফ্রান্সের উপকূল অবধি পৌঁছেছে নাৎসী জার্মানরা, নাৎসী জার্মানীর আক্রমণে লণ্ডন ধ্বংস হয়েছে।

হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করেছে বৃটিশ সরকার এবং হিটলারের নতুন এক বোমার ঘায়ে ধ্বংস হতে চলেছে ইউরোপ।

এখন খবরের কাগজ ছাপা হচ্ছে না, রেডিও ষ্টেশন ব্রডকাষ্টিং বন্ধ করছে এবং প্যারীবাসীরা আজ অনুভব করছে যে, আজই প্যারীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আকাশে ধূসর মেঘ সেই অশুভ নিয়তির অশনিসংকেত।

তারপর, পঙ্গপালের মত এলো নাৎসী জার্মানরা।

বিদেশী ইউনিফর্ম, বিদেশী মানুষ, অদ্ভুত ভাষায় ওরা কথা বলে। দু'পাশে গাছের সারি তার মাঝখানের রাস্তা দিয়ে ছোটে মস্ত বড় মার-সিডিজ লিমুসিন। তাতে নাৎসী জার্মানীর পতাকা উড়ছে। পৃথিবী জয় করতে এবং পৃথিবী শাসন করতে এসেছে জার্মান ফ্যাসিস্তরা।

দুসপ্তাহের মধ্যে লাফায়েৎ, নে ও ক্লেবারের মত স্মরণীয় ফরাসী বীর দের ষ্ট্যাচু ভেঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হলো। স্ট্যাসবুর্গে প্লাসা ও ব্রগলির নাম হলো হিটলার প্লাজা। ফরাসী খানায় বল্ড মশলা এব সসের আধিক্য বেশী হলেও আমি রেশন থেকে মুখ বদলানোর সুযোগ পেয়ে জারমান সৈনিকেরা খুশি।

এই ফ্যাসিস্ত জানোয়ারগুলো জানতোনা যে প্যারী শার্ল বোদলে-য়ারের মত কবি আলেকজানদার দুমারের মত ঔপন্যাসিক এবং মলিয়ের মত নাট্যকারের নগরী।

নাৎসী কুত্তারা প্রত্যেকে নিজস্ব উপায়ে ধর্ষণ করলো প্যারীকে। নাৎসী ঝটিকাবাহিনীর সৈনিকেরা বেয়নেট উঁচিয়ে তরুণী ফরাসী মেয়েদের তাদের সঙ্গে শুতে বাধ্য করতো।

তাদের নেতা গোয়েবলস ও হিটলার ল্যুভর ও অনেক প্রাইভেট এস্টেট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো বিখ্যাত পুরাকীর্তি, দামী ছবি, ইতিহাসের নানা রত্নসম্ভার। ফ্রান্সের এই চরম বিপর্যয়ের দিনে ফরাসী সমাজে একদিকে যেমন দেখা দিলো অবক্ষয় ও সুবিধাবাদের এক ভয়ংকর রূপ ঃ ফ্যাসিবাদী বর্বরদের সঙ্গে হাত মেলানোর জঘন্য কিছু প্রয়াস, অন্যদিকে দেখা গেলো ফরাসীদের আদর্শবাদ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সাহসের আশ্চর্য কিছু দৃষ্টান্ত।

যেখানেই আছে অত্যাচার, সেখানেই আছে প্রতিরোধ। যেখানেই ফ্যাসীবাদ, সেখানেই প্রতিবাদ রূপ নেয় সশস্ত্র ও সংগ্রামের। ফ্রান্সের বুকে শুরু হলো স্বাধীনতাপ্রেমিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অকমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে অস্তিত্বের সংগ্রাম, বিপ্লবী সংগ্রাম। শুরু হলো ফ্রান্সের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সার্ত্রর নাটক, কামুর উপন্যাস রূপকের আড়ালে তুলে ধরেছিলো ফরাসী বীরদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতিরূপ। গোপন সেই বিপ্লবী সংগ্রামের নাম, 'দ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড।'

এই আণ্ডারগ্রাউণ্ডের একটা অস্ত্র ফায়ার ব্রিগেড। ফ্রান্সে ফায়ার ব্রিগেড আর্মির কর্তৃত্বাধীনে। জারমানরা তাদের সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য বাড়ির পর বাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। গেস্টাপো ও অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের জন্য অনেক বাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জারমানদের বাড়িগুলো কোথায় সে ব্যাপারে কোনো গোপনীয়তা ছিলোনা।

ফলটা হলো মারাত্মক। সেণ্ট রেমীতে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেজিসট্যান্স-এর নেতারা প্রত্যেকটা বাড়ি কোথায়, খাতা খুলে দেখে। এক্সপার্টরা টারগেট খুঁজে বার করে। পরের দিন হয়তো দেখা গেলো; ছুটন্ত গাড়ী অথবা বাইসাইকেল থেকে কেউ একজন আচমকা একটা বোমা জানালা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে নিমেষে উধাও। তাতে বিশেষ ক্ষতি হতোনা। প্ল্যানটার বাহাদুরী অন্য জায়গায়।

জারমানরা এবার তো আগুন নেভাতে ফায়ারব্রিগেডকে ডাকবে। সব দেশেই আগুন লাগলে কেউ ফায়ারব্রিগেডের লোকদের কোনো কাজে সহজে বাধা দেন না। এক্ষেত্রেও তাই হলো।

ফরাসী ফায়ারব্রিগেডের লোকজন এলে তাদের নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে জারমানরা দেখতো, ফায়ারব্রিগেডের লোকেরা হাইপ্রেসার হোস ও কুড়ুল দিয়ে সব ভাঙচুর করছে। সুযোগ পেলে বিপ্লবীরা নিজেরা আরোও বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বলতো ওগুলো আগেই ছোঁড়া হয়েছিলো। এইভাবে জারমানদের মহামূল্য সব রেকর্ড চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে গেলো। ছ'মাস পরে জারমান হাইকমাণ্ড আন্দাজ করলো এই ফায়ারব্রিগেড সংস্থার কর্মচারীরা আসলে ফরাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী। কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলেও নাৎসী গেস্টাপোবাহিনী ওদের অ্যারেষ্ট করে রাশিয়ান ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে পাঠালো।

খাবার থেকে সাবান অবধি সবকিছুর অভাব দেখা দিলো জারমান অধিকৃত ফ্রান্সে। পেট্রল নেই, মাংস নেই, দুধ নেই। জারমানরা সব বাজেয়াপ্ত করেছে। সখের দামী জিনিসপত্রের দোকান খোলা। ক্রেতা শুধু জার্মান সৈনিকরা। তারা যে নোট দিচ্ছে, তাতে নোটের বদলে উপযুক্ত দাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছাপা হয়নি। ফরাসী দোকানদার বলে, এই নোটের দাম কে দেবে?

'দ্য ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড' হেসে বলে জারমান সৈনিকেরা।

অবশ্য ফরাসীদের সবাই যে কষ্ট পাচ্ছিলো, তা নয়। কালোবাজারের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ, জারমান পরমহলে যাদের প্রভাব, তারা ভালোই ছিলো।

জারমানরা ফ্রান্স অধিকার করায় হেলেন পেইসের জীবন খুব একটা বদলায়নি। একশো পঞ্চাশ বছরের পুরানো, ধূসর পাথরে তৈরী বাড়ি। ভেতরটা সুন্দর সাজানো। এখানে মডেলের কাজ করছে ও।

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে কোনো যুদ্ধের মতই নতুন নতুন কতো কোটি-পতির সৃষ্টি করছে। হঠাৎ বড়লোকেরা ভিড় করছে ড্রেসের দোকানে।

ওরা প্রায়ই কুপ্রস্তাব দেয় হেলেনের কাছে। এতে অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও। তফাতের মধ্যে এই, যে জার্মান কুত্তারা জার্মান ভাষায় কু-প্রস্তাব করে।

জার্মান ইউনিফর্মপরা সৈনিকরা বেড়াচ্ছে ফরাসী সঙ্গিনীদের সাথে। ফরাসীদের যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় নি তাদের বয়স বেশী। কিম্বা তারা খোঁড়া। ছেলেছোকরাদের পাঠানো হয়েছে ক্যাম্পে বা মিলিটারী ডিউটিতে। প্রত্যেকটা জারমানের মুখে ঔদ্ধত্যের ছাপ। আলেকজাণ্ডার থেকে শুরু করে প্রতি যুগের বর্বর বিজেতাদের বাহিনীর সৈনিকদের মুখে এই ভাবটাই থাকে। হেলেন ওদের ঘেন্না করে, পছন্দও করে না। ওরা ওর মন ছুঁতে পারে না।

এক ব্যস্ত অন্তর্লীন জীবনের মধ্যে বেঁচে আছে হেলেন। তার লক্ষ্য কী, সে জানে। সে জানে, কিছুই তাকে থামাতে পারবেনা। যতো শীঘ্র সম্ভব সে ক্রিশ্চিয়ান্ বারবেইৎ নামে এক গোয়েন্দার সঙ্গে যোগাযোগ করলো। রু্য সঁৎ লাজারের ওপরে এক ছোট্ট অফিসে সে

বসে। সামনে বিরাট বোর্ডে লেখা, 'ব্যক্তিগত কিম্বা ব্যবসায়িক ঃ যে কোনো ব্যাপারে গোপনে খবর নেওয়া হয়। প্রাইভেট ডিটেকটিভ বারবেইৎ এর চেহারাটা বেঁটে খাটো, মাথায় টাক, ভাঙা দাঁত, ট্যারা চোখ, নিকোটিনে বাদামী আঙুল।

হেলেন বলে, ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ঈগল স্কোয়াড্রন এর একজন আমেরিকান পাইলটের সম্বন্ধে খবর চাই।

যুদ্ধ চলছে এখন ইংল্যাণ্ড থেকে খবর জোগাড় করতে গেলে, জারমানরা প্রথমে গুলি করে, তারপর প্রশ্ন করে।' বারবেইৎ জবাব দেয়।

'যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো খবর আমার চাইনা,' অনেকগুলো নোট বার করে হেলেন।

'ইংল্যাণ্ডে আমার লোক আছে। তবে পয়সা বেশী লাগবে

তিনমাস পরে প্রাইভেট ডিটেকটিভের ফোন আসতেই হেলেন তার অফিসে গিয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করে, 'ল্যারী বেঁচে আছে তো?'

"হ্যাঁ।"

শুনে এতো নিশ্চিন্ত হলো হেলেন যে, বারবেইৎ ভাবলো, কেউ কাউকে এতো ভালোবাসে, ভাবতেও ভালো লাগে।

'তোমার বয়ফ্রেণ্ডের ট্রান্সফার হয়েছে।'

'কোথায়?'

'আর, এ, এফ-র ৬০৯ নম্বর স্কোয়াড্রন থেকে ইষ্ট অ্যাংলিয়ায় ১২১ নম্বর স্কোয়াড্রনে ট্রান্সফার হয়েছে ফেলটেন্যাণ্ট ল্যারী ডগলাস। ও এখন যে বিমান ওড়াচ্ছে, তার নাম···'

'ওসব আমি শুনতে চাইনা।' বাধা দেয় হেলেন পেইস।

'শোনার জন্যই পয়সা দিয়েছো তুমি। ও এখন হারিকেন বিমানের পাইলট। আগে ছিলো আমেরিকান বাফেলো বিমানের পাইলট। রিপোর্টটার এখানটা...একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার—ও যেসব যুবতী মেয়ের সঙ্গে শোয়, তাদের লিষ্ট—'

'গো অন—সব বলো।' উৎসাহ পেয়ে যায় যেন হেলেন।

ক্রিশ্চিয়ান বারবেইৎ প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে একদম ফালতু। ক্লায়েন্টরা আরো ফালতু। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সহজে টের পাওয়ার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা তার আয়ত্ত হয়েছে। এবং এই ক্লায়েন্ট—এই রূপসী যুবতী হেলেন পেইসের সব কিছুতেই কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ভাব। প্রথমে ও ভেবেছিল ল্যারী ডগলাস হয়তো আসলে হেলেনের স্বামী, ডিভোর্সের জন্য স্বামীর ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করাই এই মেয়েটার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাও তো ঠিক নয়। ল্যারী ডগলাসের গার্লফ্রেণ্ডের লিষ্টটা এমনভাবে পড়ছে, যেন ও লণ্ড্রির বিল পড়ছে।

'খুব খুশি হলাম,' হেলেন বললো, 'নতুন কোন রিপোর্ট পেলেই জানাবেন কিন্তু।'

হেলেন চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ অবধি চুপচাপ বসে থেকে বারবেইৎ ভাবে, মেয়েটার আসল উদ্দেশ্য কী?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই পরিবেশে জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে হঠাৎ অদ্ভুতভাবে বিকশিত হলো, জনপ্রিয় হয়ে উঠলো ফরাসী নাট্যশালা। জারমানরা আসে বিজয়গৌরবে, সুন্দরী ফরাসী সঙ্গিনীদের দেখাতে। ফরাসীরা আসে পরাজয়ের দুঃখ ভুলতে।

মার্সেইতে নিকৃষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীদের অ্যামেচার নাটক দেখেছে হেলেন। এবং প্যারীর থিয়েটারের সঙ্গে মার্সেইর সেই সব নাটকের তুলনাই হয় না।

জীবন্ত, আলোঝলমল এই নাট্যশালা। এখানে মলিয়ের, এখানে কলেইৎ এখানে ফ্রাঁসোয়া মরিয়্যাক নামে এক তরুণ লেখকের লেখা নতুন নাটক দেখেছে হেলেন। এবং কমেদি ফ্রাঁসেই-তে সে দেখেছে শতাব্দীর এক স্মরণীয় নাট্যকার পিরানদেল্লোর নাটক।

একটা নাটক সবচেয়ে অভিভূত করেছিলো তাকে।

নাট্যকার : জাঁ পল সার্ত্র। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক লিখেছেন আশ্চর্য এক নাটক : হুই ক্লো। এবং সেই নাটকের নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছে ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেতা ফিলিপ সরেইল।

লোকটা দেখতে কুৎসিত, বেঁটে, মোটা, ভাঙা নাক, বক্সারের মুখের মতো।

অথচ স্টেজে দাঁড়িয়ে ফিলিপ সরেইল কথা বললেই যেন ম্যাজিক। তখন সংবেদনশীল সুন্দর এক পুরুষের রূপ নেয় সে দর্শকের চোখে। এমনি তার অভিনয়ের ক্ষমতা।

দিনের পর দিন, থিয়েটারের সামনের সারির আসনে বসে ফিলিপের অভিনয় দেখছে মুগ্ধ হেলেন। সে মনে মনে ভাবে, এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীশক্তির রহস্য কী? কেমন করে শুধু অভিনয়ের ক্ষমতা কুৎসিত এক ব্যাঙকে সুন্দর এক রাজপুত্রে বদলে দেয়?

এক সন্ধ্যায় হেলেনকে ইন্টারভ্যালের সময় একটা চিঠি দিয়ে গেলো থিয়েটারের কর্মচারী।

তাতে লেখা রাতের পর রাত অভিনয়ের সময় স্টেজ থেকে দেখি, তুমি সামনের সীটে বসে আছো। অনুগ্রহ করে আজ সন্ধ্যায় স্টেজের পেছনে এসো। ইতি পি, এস।

ফিলিপ সোরেইল বড় অভিনেতা। কিন্তু ওর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোনো আগ্রহই নেই হেলেনের। তবে সুযোগটা সে লুফে নেয়। তাকে জীবনে বড় হতে হবে। একদিন তার দিন আসবে। বিশ্বাসঘাতক ল্যারী ডগলাসের ওপর সে প্রতিশোধ নেবে। এই তার শুরু। ফিলিপ সোরেইলকে কাজে লাগাবে।

'কাছে এলে তোমায় আরো সুন্দরী মনে হয়,' আয়নার সামনে মেকাপ মুছতে মুছতে বলছে ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা।

'ধন্যবাদ, মসিয়ঁ সরেইল।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'মার্সেই।'

'চাকরী খুঁজছো?'

'না।'

হেলেন একদৃষ্টিতে দেখছে ফিলিপকে। ফিলিপ বলে, 'তুমি কী দেখছো?'

'তোমাকে।'

নৈশভোজের পর ফিলিপের সুন্দর ফ্ল্যাটে শোয়ার পালা। শয্যাসঙ্গী হিসেবে ফিলিপ কৌশলী, কিন্তু স্বার্থপর নয়। হেলেনের সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু আশা করেনি রমণীরমণে পটু, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। কিন্তু দেহ মিলনের ব্যাপারে হেলেন সুখ দিতে কতো পটু তা দেখে চমকে ওঠে ফিলিপ।

ক্রাইস্ট ! তুমি ফ্যান্টাসটিক ! এসব কোথায় শিখলে তুমি ?'

হেলেনের কাছে পুরুষের শরীর এক বাদ্যযন্ত্রের মত, যার গভীর থেকে সুর তুলে নিয়ে আসতে হয়, নিজের শরীরের সুরে মেলাতে হয়।

'আমি জন্ম থেকেই জানি।'

ওর আঙ্গুলের ছোঁয়া, হালকা ছোঁয়া ফিলিপের ঠোটে, বুকে পেটে। ওর পুরুষাঙ্গ আবার শক্ত হয়ে উঠছে দেখে নগ্ন হেলেন উঠে বাথরুমে যায়। একটু পরে সে ফিরে এসে উত্থিত পুরুষাঙ্গ নিজের মুখে পোরে। তার মুখের ভেতরটা ঈষদুষ্ণ।

'ওহ, ক্রাইস্ট।' ফিলিপ বলে।

সারা রাত ধরে ওরা শরীরে শরীর মেলালো। সকালে ফিলিপ বলে, এখন থেকে তার ফ্ল্যাটেই থাকবে হেলেন।

ছমাস ফিলিপ সোরেইলের জীবনসঙ্গিনী ও শয্যাসঙ্গিনী ছিলো ও। তার সুখ নেই, অসুখ নেই। সোরেইলকে সে সুখ দেয়। কিন্তু, তার চোখে ফিলিপের কোন গুরুত্ব নেই ব্যক্তি হিসাবে। হেলেন যেন ছাত্রী, তাকে রোজই নতুন কিছু শিখতে হবে। ফিলিপ যেন একটা স্কুল। এবং হেলেন জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ফিলিপের বিশেষ একটা স্থান আছে।

হেলেন তার শয্যাসঙ্গিনী। কিন্তু, তাদের এই সম্বন্ধের ব্যক্তিগত কোন সম্পর্কের রেশ রাখেনি হেলেন। না, ফিলিপকে সে কোনোদিন ভালোবাসেনি, কোনদিন ভালোবাসবেও না। ভালোবাসার ভুল জীবনে দুবার করেছে হেলেন। প্রথমবার সে তার বাবাকে ভালোবেসেছিলো। দ্বিতীয়বার ঃ সে লেফটেন্যান্ট ল্যারী ডগলাসকে ভালোবেসেছিলো। দুজনেই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার বাবা টাকার লোভে

তাকে বেচে দিয়েছিলো বুড়ো খদ্দেরের কাছে। ল্যারী···ল্যারীর সঙ্গে আগে যেসব পার্কে বা রেস্তোরাঁয় গেছে হেলেন, আজও সে সব পার্ক বা রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে হাঁটতে গেলে অদ্ভুত এক ঘৃণা তার মনের আড়ালে জেগে উঠে। হেলেনের ভাবনার জগতে পুরুষ তো একজনই। তার নাম ল্যারী ডগলাস।

সোরেইলের ফ্ল্যাটে উঠার দুমাস পরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ক্রিশ্চিয়ান বারবেইৎ-এর ফোন পেলো হেলেন। ছুটে যায় ও গোয়েন্দার অফিসে।

'আর একটা রিপোর্ট আছে

'ল্যারী ভালো আছে।'

ডিটেকটিভের কেমন যেন লাগে। অদ্ভুত, মেয়েটা অদ্ভুত···কী চায় ও? 'হ্যাঁ।'

এবারের রিপোর্ট পঁচটা জারমান প্লেন গুলি করে নামিয়ে ক্যাপটেন পদে প্রমোশন পেয়েছে পাইলট ল্যারী ডগলাস। এবং ল্যারী যেসব মেয়ের সঙ্গে শোয়, তাদের লিষ্ট। শোগার্ল থেকে শুরু করে এক আণ্ডার সেক্রেটারীর বউয়ের নাম আছে লিস্টে।

'আবার কোন খবর পেলেই জানাবেন' টাকা ভর্তি খাম গোয়েন্দার হাতে তুলে দিয়ে বলে।

হেলেন ফিলিপের জন্যে সুস্বাদু খাবার রাঁধে দোকানবাজার করে, ফ্ল্যাট পরিষ্কার রাখে এবং ফিলিপের ইচ্ছে হলেই তার সঙ্গে শোয়। ফিলিপের বন্ধুদের ধারণা, ফিলিপের ভাগ্য ভালো।

তারপর একরাতে হেলেন বলে, 'ফিলিপ, আমি অভিনেত্রী হতে চাই।'

'তুমি সুন্দরী। অভিনেত্রীদের সঙ্গে অনেক মিশেছি আমি। তুমি ওদের মত হও, আমি চাইনা। অন্যরকম, অন্যরকমই থাকো। তুমি যা চাও, তাই তো দিই আমি। সোজা সাপটা কথা ফিলিপের।

'হ্যাঁ, ফিলিপ।' মেনে নিলো যেন ওর কথা হেলেন।

পরের রবিবার ছিলো হেলেনের জন্মদিন। ম্যাকসিমে পার্টি দিলো ফিলিপ। ওর বন্ধুরা উপহার দিলো। ডিনার শেষ হলে ব্র্যানডি ও শ্যামপানের নেশায় ঈষৎ মাতাল, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মাঞ্চা-ভিনেতা, সার্ত্রর নাটকের নায়ক বলে, 'শোন বন্ধুরা, হেলেনকে আমি বিয়ে করবো।' সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে হেলেনকে।

দূরের এক কোণে একা বসে আছে দীঘল এক পুরুষ, খুব রোগা, মুখে ভাবনার ছাপ। পার্টিতে সে যেন শুধু দর্শক, অতিথি নয়। দীর্ঘ সিগারেট হোল্ডারে সিগারেট পুড়ছে। লোকটা নিঃস্পৃহ এক দর্শকের উদাসীন বিদ্রূপমেশানো হাসি হাসছে, যেমন হেসেছে চিরদিন। লোকটা বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী চিত্র ও নাট্য পরিচালক আরমাঁদ গতিয়ের।

আধুনিক ফরাসী চলচ্চিত্র ও নাটকের ক্ষেত্রে অসাধারণ এক প্রতিভা। সে নাটক বা ফিল্ম পরিচালনা করছে শুধু জানালেই দর্শকের ভিড় ভেঙে পড়ে। অভিনেত্রীদের পরিচালনার ব্যাপারে তার অসাধারণ ক্ষমতা। অন্তত দুজন অভীনেত্রী তার প্রতিভার ছোঁয়ায় চিত্র ও মঞ্চ জগতের তারকা হয়েছে। নাটক তার জীবন। এবং জীবনের অভিনয়ে সে শুধু দর্শক। একটু পরে ফিলিপ বন্ধুদের সঙ্গে দূরে যেতেই আরমাঁদের কাছে যেয়ে হেলেন বলে, 'মশিয়ঁ গতিয়ের, তোমার বাড়ির ঠিকানা আমার জানা। আজ রাত বারোটায় দেখা হবে।'

আরমাঁদের ফ্ল্যাট। আরমাঁদ বলছে, 'মিস পেইস আমাকে কেন? এমন একজন পুরুষ তোমায় বিয়ে করতে চাইছে, যে নামজাদা এবং ধনী। আর তুমি যদি অন্য পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে চাও, আমার চেয়ে সুন্দর, কমবয়সী, ধনী যুবকের অভাব নেই। আমি কেন?'

'তুমি আমায় অভিনয় শেখাবে অকপট স্বীকারোক্তি হেলেনের।

'আমি নিরাশ হলাম। আমি অন্য কিছু আশা করেছিলাম। নতুন কিছু। সুন্দরী মেয়েরা অভিনেত্রী হবার লোভে রাতদিন আমায় অনুসরণ করে। ছোটখাট ভূমিকা যাদের দিই, তারা নায়িকার ভূমিকার লোভে আমার শয্যাসঙ্গিনী হতে চায়। নতুন কিছু নয়।'

অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিচালনা করাই তোমার পেশা? জিজ্ঞেস করে হেলেন। 'পেশাদারদের, অ্যামেচারদের নয়। তুমি কখনো অভিনয় করেছো?

'না। তুমি আমায় শেখাবে। তোমার বেডরুমটা কোন্ দিকে?'

আরমাঁদ ভাবছিলো, ফিলিপের হবু বউ অভিনেত্রী হবার লোভে তার সঙ্গে, বেশ্যা, সব মেয়েই বেশ্যা!

আরমাঁদ ফরাসী পুরুষ। যৌনমিলন তার কাছে এক শিল্পকলা। জারমান ও আমেরিকান পুরুষ, কোনো মেয়ের ওপর চড়া, কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে টুপি পরে বিদায় নেওয়া এটুকুই শুধু জানে। কিন্তু আরমাঁদ আদন্দ দিতে ও আনন্দ পেতে ভালোবাসে, ঘরে সুগন্ধি ভাসবে নরম সুর বাজবে রেকর্ড প্লেয়ারে।

কিন্তু, হেলেন তো এক রাতের। দেহমিলন হয়ে গেলেই ওকে সাফ-সাফ বলে দেবে, প্রত্যেক মেয়ের দুই পায়ের মাঝখানে যা আছে, তার বিনিময়ে আরমাঁদ গতিয়েরের মত বুদ্ধিজীবীর দামী মগজটা কেনা যায়না।

আরমাঁদ হেলেনের ওপর উঠতে গেলে ওকে থামায় হেলেন। তার জিভ ওর ঠোঁটে ওর বুকে, পেট ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওর হাত তার পুরুষাঙ্গে একটা মলম মাখাচ্ছে। এক সময় পাগল হয়ে ওঠে গতিয়ের। যৌন-মিলনের এতো সুন্দর অভিজ্ঞতা আরমাঁদের জীবনে আর কখনোও হয়নি।

'আরমাঁদ, আমি অভিনেত্রী হতে চাই। তুমি আমায় শেখাবে...'

ছোট্ট একটা সন্ধিতে রাজি হয় আরমাঁদ। শেলফ থেকে সে তুলে নেয় গ্রীক ক্লাসিক নাট্যকার ইউরিপিদিসের লেখা নাটক, জটিল নাটক সে বলে, 'এইটা তুমি মুখস্থ করো, শোনাও, তারপর দেখা যাবে তোমার প্রতিভা আছে কিনা।'

'ধন্যবাদ আরমাঁদ, তুমি শুনে খুশিই হবে—'

কিন্তু আরমাঁদ জানে, গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিসের সংলাপ খুবই কঠিন ও জটিল। মুখস্থ দুই সপ্তাহেও হবে কিনা সন্দেহ। হেলেন হাল ছেড়ে দেয়ার পর আরমাঁদ বোঝাবে; অভিনয় কতো কঠিন ব্যাপার। এবং অভিনেত্রী হবার উচ্চাশা হারিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে এই রূপসী।

ফিলিপ সরেইলের ফ্ল্যাটে যেতেই ও চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইউ বিচ! সারা রাত কোথায় ছিলে?'

'অন্য এক পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি, ফিলিপ। এখন আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবো।'

'হেলেন, খৃষ্টের দোহাই, তুমি যেওনা! আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। আমাদের বিয়ে হবে।'

ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় মঞ্চনায়ক, জাঁ পল সার্ত্রর লেখা নাটকের সফল নায়ক ফিলিপ তর্ক করছিলো, ভয় দেখাচ্ছিলো, কাঁদছিলো কিন্তু, কিছুতেই কিছু হলোনা। হেলেন চলে গেলো।

এবং নায়ক জানলোনা, কেন সে নায়িকাকে হারালো। কেননা হেলেনের জীবনে যে তার কোন ঠাঁই নেই, সেকথাও তো কখনো বোঝেনি নায়ক ফিলিপ।

ইউরোপের ন্যুভেল ভাগ ফিল্ম আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ও আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক আরমাঁদ যখন নাটকের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন বিশ্বভুবন তার অস্তিত্ব থেকে দূরে চলে যায়। আর দুসপ্তাহ পরেই নতুন নাটক দেখানো হবে আরমাঁদের পরিচালনায়, প্যারীর রামেঁহেক। এখন থিয়েটারের চার দেয়াল এবং অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়া অন্য কিছুই তো মনে থাকার কথা নয় মহান চিত্র ও নাট্যপরিচালকের। অথচ আজ এমন হচ্ছে, এক একটা দৃশ্যের রিহার্সাল শেষ হচ্ছে, অভিনেতা অভিনেত্রীরা পরিচালকের মতামত শুনতে চাইছে অথচ কিছু খেয়ালই করছে না আরমাঁদ। তার চোখের সামনে ভাসছে বিবসনা হেলেনের উলঙ্গ শরীর। শরীর নিয়ে খেলা। পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে ওঠে রিহার্সালের মাঝখানে, বাধ্য হয়ে রিহার্সাল বন্ধ রাখে আরমাঁদ।

সব কিছু বিশ্লেষণ করাই প্রতিভাবান এই পরিচালকের বৈশিষ্ট্য। হেলেন সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শোয়ার অভিজ্ঞতা পৃথিবী বিখ্যাত পরিচালকের জীবনে তো নতুন নয়। শরীর দিয়ে খেলায় খুব পটু হেলেন। কিন্তু এ ধরনের অন্য মেয়েও তো দেখেছে আরমাঁদ। বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু প্রতিভার বিদ্যুত ঝলক তো দেখা যায়না হেলেনের মধ্যে। তবে কোথায়, ঠিক কোথায় ওর আকর্ষণী ক্ষমতা? ও যা চায়, তাই পাওয়ার মত ক্ষমতা রাখে। ওর মধ্যে এমন কিছু আছে যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এবং আরমাঁদ জানে, সে হেলেনের শরীর ছুঁয়েছে, অস্তিত্বকে ছুঁতে পারেনি।

সে রাতেও আরমাঁদকে অদ্ভুত আনন্দ দেয় হেলেন। সকালে চমৎকার ব্রেকফাস্ট তৈরী করে আনে। ক্রেপ, বেকন, জ্যাম, গরম কফি।

আরমাঁদ নিজেকে বলে, ঠিক আছে, ও যুবতী, দেখতে ভালো, শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে ভালো, রাঁধে ভালো। কিন্তু বুদ্ধিজীবী পুরুষের পক্ষে তাই কী যথেষ্ট? খাওয়া শোয়া ছাড়াও সে কথা বলতে চাইবে। ও তোমায় কোন কথা শোনাতে পারে?

অথচ নিজের মনেই সে উত্তর পায়, তাতে কোনো কিছু যায় আসেনা।

সে রাতে, পরের রাতে দেহমিলন হলো। নাটকের কথা, অভিনয়ের কথা কিছুই হলোনা।

কিন্তু, চতুর্থ রাতে, হেলেন বেডরুমে না ঢুকে বলে, 'আমার অভিনয় দেখবে, ডায়ালগ শুনবে না?'

'তোমার মুখস্থ হলেই—'

'আমি তৈরী।'

'পড়লে হয়না, মুখস্থ করতে করতে হয়।'

'মুখস্থ হয়ে গেছে। তুমি শুনবে?'

'নিশ্চয়ই। ধরো, ঘরের মাঝখানে তোমার স্টেজ। আমি যেখানে বসে আছি, সেখানে দর্শক—'

নাটকার ইউরিপিদিস।

গ্রীক ট্র্যাজিডির মহান স্রষ্টা। এই সব মহান নাটকের মহান নায়ক নায়িকা যুদ্ধ করে নিয়তির সঙ্গে নয়, কেননা তাদের মহান ট্র্যাজিডির কারণ লুকিয়ে আছে তাদের নিজেদেরই আত্মার গভীরে। মিডিয়া, ইলেকট্রা এবং ইফিজেনিয়া—ট্র্যাজিডির নায়িকা। এবং ট্র্যাজিডির নায়িকা অ্যানড্রোম্যাকে—ট্রয় যুদ্ধের নিহত নায়ক হেক্টরের ঘরণী। ট্র্যাজিডির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রূপকার ইউরিপিদিস যাকে গড়েছিলেন গভীর মমতা দিয়ে।

ইউরিপিদিস। মহান স্রষ্টার ক্লাসিক ট্র্যাজিডির জটিল সংলাপ বলছে হেলেন। সে অভিনয় করছে হেক্টরের বিধবা বউয়ের করুণ ভূমিকায় এবং কৌচে বসে শুনছে সমকালীন ফরাসী রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক আরমাঁদ। ভালো অভিনয় দেখলে, সংলাপ সুন্দর হলেই তার শরীরে শিহরণ জাগে। এখনও জাগছে। না অভিনয়ে এক্সপার্ট নয় হেলেন। তার প্রতিটি ভঙ্গিতে অনভিজ্ঞতার ছাপ। কিন্তু তার যা আছে, তা অভিজ্ঞতার চেয়ে, কৌশলের চেয়ে অনেক বড়। যা সংলাপকে নতুন রং, নতুন তাৎপর্য দিয়েছে।

ইউরিপিদিসের নাটকের নায়িকার আত্মকথন শেষ হলো।

আরমাঁদের চোখে জল।

'হেলেন একদিন তুমি ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবে। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয় শিক্ষক জজ ফাবেয়ার। আমি তোমাকে তার কাছেই

পাঠাবো। ওর কাছে তুমি অভিনয় শিখবে - - -'

'না।'

'না কী? অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্রছাত্রী ছাড়া কাউকে কখনো অভিনয় শেখায়না জজ। আমি তাকে বললে তবে সে তোমাকে অভিনয় শেখাতে রাজী হতে পারে।'

'তুমি আমার অভিনয় শেখাবে।'

'আমি কাউকে অভিনয় দেখাইনা। আমি পরিচালক, শুধুমাত্র পরিচালক। ট্রেনড ও পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের আমি পরিচালক। তুমি অভিনয় শেখো, পেশাদার হও তখন আমি আমার নাটকে ঠাঁই দেবো বুঝেছো?'

'হ্যাঁ, আমি বুঝেছি, আরমাঁদ।'

সে রাতে যৌনমিলনের আনন্দ আগের যে কোন রাতকেও ছাড়িয়ে যায়। সকালে চমৎকার ব্রেকফাষ্ট রাঁধে হেলেন। তারপর থিয়েটারে যায় আরমাঁদ। থিয়েটার থেকে হেলেনকে ফোন করলে কোনো জবাব এলোনা। রাতে ফ্ল্যাটে ফিরে আরমাঁদ দেখলো, ফ্ল্যাট ফাঁকা।

হেলেনের ফ্ল্যাটে ফোন করলে জবাব আসেনা।

হেলেনের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করলে কেউ টেলিগ্রাম নেয়না।

প্রতিভাবান আরমাঁদ সমকালের শ্রেষ্ঠ পরিচালক আরমাঁদ এখন যে কোনো মূল্যে ফিরে পেতে চায় হেলেনকে। যে আরমাঁদ থিয়েটারের রিহার্সালের সময় বিশ্বভুবনের কথা ভুলে যায়—সেই আরমাঁদ রিহার্সালের সময় আনমনা। অভিনেতা অভিনেত্রীদের এমন খিস্তিখেউড় করছে আরমাঁদ যে ষ্টেজম্যানেজার বাধ্য হয়ে রিহার্সাল বন্ধ করে দিলো।

আরমাঁদ নিজেকে বোঝায়, হেলেন শুধুমাত্র একটা মেয়েমানুষ, সস্তা একটা মেয়েমানুষ, যার বুদ্ধি নেই, শুধু উচ্চাশা আছে, অভিনেত্রী হওয়ার উচ্চাশা। কিন্তু, হেলেনকে তার চাই। ওকে না পেলে সে পাগল হয়ে যাবে। রাতে প্যারীর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আরমাঁদ। অচেনা বারে মদ খেয়ে নেশা করছে আরমাঁদ।

এক সপ্তাহ পরে ভোর চারটেয় বাড়ি ফিরে মাতাল আরমাঁদ দেখে আলো জ্বলছে, ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে হেলেন।

'হ্যালো, আরমাঁদ।'

আঃ, কি যে শান্তি। সুখ ফিরে এসেছে।

'হেলেন, কাল আমি তোমায় অভিনয় শেখাবো। এই নাটকেই তুমি অভিনয় করবে।'

ছয়

ওয়াশিংটন, আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র, শক্তি ও স্ফূর্তিতে ভরা আমেরিকার স্পন্দমান হৃদয়। কিন্তু তখন যুদ্ধের আশংকা। রাস্তায় সৈনিকদের পরণে আরমি, নেভি, এয়ার কর্প এর ইউনিফর্ম।

যেন বিশ্বযুদ্ধ এখান থেকেই শুরু হবে। এখানেই হবে যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধ পরিকল্পনা। আমেরিকা যদি যুদ্ধ ঘোষণা না করে হিটলার বিশ্ববিজয়ী হবে। এবং ওয়াশিংটনের ওপরে নির্ভর করছে পৃথিবীর নিয়তি। ক্যাথরিন অ্যালেকজাণ্ডার এই ওয়াশিংনের অংশ হতে চলেছে।

প্রাক্তন সহপাঠিনী সুসি রবার্টস বলে, 'ভালো ড্রেস পরো। আজ রাতে ডিনার ডেট আছে। এতো সব নিঃসঙ্গ পুরুষ এখানে...'

উইলার্ড হোটেলে ডিনার। সুসির ডেট ইনডিয়ানা থেকে আসা এক কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে। ক্যাথরিনের ডেট অরিগন থেকে আসা রাজনীতিবিদ। দু'জনেই বিবাহিত, কেউ বউকে সঙ্গে আনেনি। ক্যাথরিন চাকরী খুঁজছে। তার বদলে তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে শোয়ার প্রস্তাব দিলো লোকটা। ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ক্যাথরিন।

রাতে পাশের ঘরে খাটের স্প্রিং-এর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। সুসি শুয়েছে মার্কিন কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে। বালিশ দিয়ে কান ঢাকার চেষ্টা করে ক্যাথরিন।

'কয়েকদিন পরেই সুসি খবর দিলো, পার্টিতে একটা মেয়ে বললো, ও চাকরী ছেড়ে টেকসাসে ফিরে যাচ্ছে। ও ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের পাবলিক রিলেশনস-এর ইনচার্জ বিল ফ্রেজারের প্রাইভেট সেক্রেটারীর চাকরী করতো। এই চাকরী যে খালি হয়েছে, অনেক মেয়েই তা জানেনা। তুমি যদি যাও, হয়তো চাকরীটা পাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, গতমাসে নিউজ উইকের প্রচ্ছদে বিল ফ্রেজারের ছবি ছিলো।'

'ধন্যবাদ। আমি যাচ্ছি।'

কুড়ি মিনিট পরেই স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসের দিকে ছুটলো ক্যাথি। অফিসের বাইরের ঘরে ঢুকেই ক্যাথি দেখে, এক গাদা মেয়ে। দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে, সবাই একসঙ্গে বকবক করছে। রিসেপশনিষ্ট প্রাণপণে বোঝাচ্ছে, 'মিষ্টার ফ্রেজার এখন বড্ড ব্যস্ত। এতো মেয়ের সাথে দেখা করা ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা...

একজন মেয়ে জানতে চায়, 'উনি সেক্রেটারী পদের জন্য মেয়েদের ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন ?

'হ্যা, তা নিচ্ছেন বটে। কিন্তু, মাই গড, এতো মেয়ে, হাস্যকর ব্যাপার।'

করিডরের দরজা খুলে ঢুকলো আরো তিনটে মেয়ে।

একজন জিজ্ঞেস করলো, 'সেক্রেটারীর জন্যে মেয়ে বাছা হয়ে গেছে ?

আর একজন রসিকতা করে বললো, 'বিল ফ্রেজার যদি আরব শেখদের মতো হারেম রাখে, আমরা সবাই ঠাঁই পেতে পারি হারেমে।'

সেই মুহূর্তে, ভেতরের দরজা খুলে বাইরে এলেন এক লোক। ছয় ফুটের কিছু কম লম্বা, অ্যাথলিট না হলেও নিয়মিত শরীরচর্চার গুণে মেদহীন শরীর, মাথায় কোঁকড়ানো সোনালী চুল, কপালের কাছে ধূসর রঙের ছোঁয়া, চোখের তারার রং চকচকে নীল এবং চোয়ালটা বড্ড শক্ত। গলাটা ভারী এবং কর্তৃত্বপূর্ণ, 'স্যালি, এখানে হচ্ছেটা কি ?'

'স্যার, মেয়েরা খবর পেয়েছে, আপনার সেক্রেটারীর পদ খালি আছে তাই···'

'জেসাস ! আমি নিজে তো খবরটা পেলাম মোটে এক ঘণ্টা আগে—'

উনি সোজা তাকালেন ক্যাথরিনের দিকে এবং ক্যাথি যথারীতি ভাবী সেক্রেটারীর হাসি হাসলো। ভ্রূক্ষেপ না করে মিষ্টার ফ্রেজার তাঁর রিসেপশনিষ্টকে বললেন, 'তিন-চার সপ্তাহ আগের লাইফ ম্যাগাজিনের একটা সংখ্যার প্রচ্ছদে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক জেসেফ স্তালিনের ফটো ছিলো। সংখ্যাটা আমার এখুনি চাই। দুমিনিটের মধ্যে। সিনেটর বোরা ফোনের লাইন ধরে আছেন। ওই সংখ্যায় জোসেফ স্তালিন সংক্রান্ত একটা প্যারাগ্রাফ আমি ওকে পড়ে শোনাতে চাই। ওটা আমার এখুনি চাই।'

বলেই ভেতরে চলে গেলেন ফ্রেজার।

রিসেপশনিস্ট ফোন করছে টাইম-লাইফ ব্যুরোকে।

'হ্যালো, ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের মিষ্টার উইলিয়ম ফ্রেজারের অফিস থেকে বলছি। যে সংখ্যায় জোসেফ স্তালিনের ফটো ছিলো, সেই সংখ্যাটা আমার চাই। সে কী? পুরোনো সংখ্যা আপনাদের কাছে নেই? কাকে ফোন করবো? আই সী। থ্যাংক ইউ।'

ফোন রাখলো রিসেপশনিষ্ট।

একটা মেয়ে বললো, 'হনী, তোমার ভাগ্য খারাপ।'

আর একটা মেয়ে বললো, 'বিল যদি আজ রাতে আমার ফ্ল্যাটে যায়, আমি ওকে ওটা পড়ে শোনাবো।'

সবাই হাসলো।

তার অনেক আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে ক্যাথরিন।

ইনটারকমে বিল ফ্রেজার ফোন করছেন স্যালিকে।

'স্যালি, দুমিনিট হয়ে গেছে। ম্যাগাজিনটা কোথায়?'

'মিষ্টার ফ্রেজার, আমি টাইম লাইফ ব্যুরোয় ফোন করতে ওরা বললো, ওরা কোন সাহায্য করতে পারবেনা···'

সেই মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেতরে এলো ক্যাথরিন।

তার হাতে লাইফ ম্যাগাজিনের পুরোনো সংখ্যা।

কভারে জোসেফ স্তালিনের ছবি। ম্যাগাজিনটা ক্যাথি স্যালির হাতে তুলে দিতে রিসেপশনিষ্ট ইনটারকমে বললো, 'একটা কপি পেয়েছি, মিষ্টার ফ্রেজার। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

পাঁচ মিনিট পরে ভেতরের অফিসের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বিল ফ্রেজার। সঙ্গে স্যালি। স্যালি ক্যাথিকে দেখিয়ে বললো, 'এই মেয়েটি স্যার।'

এবং বিল ফ্রেজার ক্যাথিকে বললেন, 'প্লিজ, ভেতরে আসুন।'

'ইয়েস, স্যার।'

ক্যাথি ভেতরে ঢোকার সময় অন্য মেয়েদের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি অনুভব করলো পিঠে।

ফ্রেজার দরজা বন্ধ করলেন। অফিসের ফার্নিচার ফ্রেজারের ব্যক্তিগত সুরুচির ছাপ। ফ্রেজার বললেন, 'তোমার নাম?'

'ক্যাথরিন অ্যালেকজাণ্ডার।'

'তিন সপ্তাহ আগের লাইফ ম্যাগাজিনের কপি নিশ্চয়ই তোমার ব্যাগে ছিলোনা।'

'না স্যার, আমি নিচের সেলুনে গিয়েছিলাম। পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা সচরাচর থাকে সেলুনে ও ডেন্টিটের অফিসে।'

'আই সী। কিন্তু এই আইডিয়া আমার মাথায় আসতো না। সব ব্যাপারেই তোমার এমনি উপস্থিত বুদ্ধি?'

রন পিটারসনের সঙ্গে দুঃখজনক যৌন অভিজ্ঞতার কথা ভেবে ক্যাথি বললো, 'না স্যার।'

'তুমি সেক্রেটারী হতে চাও?'

'না—মানে, সুযোগ পেলে হতে চাই। তবে আপনার সহকারী হলেই খুশি হব।'

'আজ থেকে সেক্রেটারী হও। পরে অ্যাসিস্টাণ্ট হবে।'

'তার মানে, চাকরীটা আমিই পেলাম?'

'পরখ করে দেখা যাক তোমাকে। স্যালি, অন্য মেয়েদের ধন্যবাদ দিয়ে জানাও, পদটা খালি নেই। ক্যাথি, তোমার মাইনে সপ্তাহে তিরিশ ডলার হলে তুমি খুশি তো?'

'ধন্যবাদ, মিষ্টার ফ্রেজার।'

'তাহলে কাল সকালে নয়টায় এসো অফিসে। স্যালি ওকে ফর্ম দাও নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখবে.....

মিষ্টার বিল ফ্রেজারের অফিস থেকে ওয়াশিংটন পোষ্টের অফিসে যায়ে ক্যাথি বললে, 'আমি উইলিয়ম ফ্রেজার সম্বন্ধে আপনাদের ফাইল দেখতে চাই। আমি তাঁর পারসোন্যাল সেক্রেটারী।'

'অদ্ভুত অনুরোধ। কেন, বস ঝামেলা করছে?'

'না, আমি ওঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবো।'

পাঁচ মিনিট পরে একজন ক্লার্ক ফাইলটা দেখালো ক্যাথরিনকে।

উইলিয়ম ফ্রেজার—বয়স পঁয়তাল্লিশ, প্রিন্সটন ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট, ফ্রেজার অ্যাসোসিয়েটস নামক বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। একবছর আগে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত অনুরোধে সরকারী চাকরী নিয়েছেন। লিডিয়া ক্যাসপিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। চার বছর হলো ডিভোর্স হয়েছে। নিঃসন্তান, কোটিপতি। জর্জটাউন ও মেইনে বাড়ি আছে, হবিঃ টেনিস ও নোমো খেলা ও নৌকো চালানো। আমেরিকার বহু মেয়েই ওঁকে বিয়ে করতে চায়—যোগ্যতম এক সুপাত্র।

চাকরী পাওয়ার সুখবর সুসিকে এসে জানাতে সে বললো, 'চলো, বয়-ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়া যাক। আরমিতে সদ্য নাম লিখিয়েছে, অ্যানাপোলিসের অধিবাসী এমন দুই ধনী যুবক ওদের ডিনার খাওয়ালো, 'আরসেনিক অ্যাণ্ড ওল্ড লেগ' সিনেমাটা দেখালো, তারপর ক্যাথরিন বললোঃ সে উঠে যাচ্ছে। ওদের একজন তখন কৌচে সুসিকে জড়িয়ে ধরেছে। অন্যজন বললো—'ক্যাথি

আমরা তো এখনও শুরুই করিনি। ওদের দেখো এখুনি যুদ্ধ বাঁধবে। আমার এই জিনিসটা ছুঁয়ে দেখো, কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় তুমি কী কোনো সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে চাও?'

'আমি ভেবে দেখেছি, আমি শুধুমাত্র আহত সৈনিকদের সঙ্গেই শোবো।'

বেডরুমে একাই গেলো ক্যাথি এবং দরজা বন্ধ করে দিলে। মিষ্টার উইলিয়ম ফ্রেজারকে দেখার পর থেকে অন্য কোনো পুরুষকে তার ভালো লাগছেনা।

পরের দিন সকালে সাড়ে আটটায় অফিসে গিয়ে ক্যাথি দেখলো, ডিকটোফোনে কথা বলছেন ফ্রেজার। ক্যাথিকে দেখেই মেশিন বন্ধ করে উনি বললেন, 'তুমি এতো তাড়াতাড়ি এসেছ কেন?'

চাকরীর প্রথম দিন। সব দেখে শুনে···

'বোসো। মিস অ্যালেকজাণ্ডার, গোয়েন্দাগিরি পছন্দ করিনা।'

'তার মানে?'

'ওয়াশিংটন ছোট শহর, প্রায় গ্রামই বলা চলে। এখানে কোনোকিছু গোপন থাকেনা তুমি ওয়াশিংটন পোষ্ট অফিসে যাবার দুমিনিট পরে ওদের প্রকাশক আমায় ফোন করে জানালো, তুমি আমার সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছো।'

'গোয়েন্দাগিরি বা নাক গলানো আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। ভালো সেক্রেটারীর উচিত বসের সম্বন্ধে সব বিষয় জানা এবং মানিয়ে চলা। ঠিক আছে, মিষ্টার ফ্রেজার, আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি।'

'বোসো। নাচিয়ে নাকিয়াদের মত মেজাজ দেখিওনা—বোসো। প্লীজ! এই তো, তুমি এতো সহজে আঘাত পাও কেন?' চেয়ারে গা

এলিয়ে দিয়ে ফে্জার বললেন, 'হয়তো আমি সহজেই চটে যাই। আমেরিকার সব থেকে জনপ্রিয় ব্যাচিলার—প্রত্যেক অবিবাহিতা মহিলার সহজ শিকার—মহিলারা কি ভীষণ আক্রামণাত্মক ভূমিকা নিতে পারে না দেখলে তুমি বুঝবেনা। যাক সে, আমার কথা বাদ দাও। এবার তোমার কথা বলো। বয়ফে্ও আছে?'

'না বিশেষ কেউ নেই।'

'কোথায় থাকো?'

'কলেজে আমার ক্লাসমেট ছিলো তার ওখানে থাকি।'

'নর্থওয়েষ্টার্ন ইউনিভার্সিটি?'

ক্যাথি চমকে ওঠে, তারপর ওর মনে পড়ে: ফর্মে সব লেখা হয়েছে এবং ফর্ম নিশ্চয়ই পড়েছে ফে্জার।

'হ্যাঁ স্যার।'

'আমার সম্বন্ধে যে কথাটা খবরের কাগজে ছাপা হয়নি, তা আমি বলে দিচ্ছি! আমি কাজের ব্যাপারে 'সন অফ এ বিচ।' কাজ একবারে নিখুঁত না হলে আমার পছন্দ হয়না। তাছাড়া আমি ঘন ঘন কালো গরম কফি খাই।'

'আমার মনে থাকবে।'

'ক্যাথরিন, আর একটা কথা। আজ রাতে বাড়ি যেয়ে আয়নার সামনে দাড়িয়ে মুখখিস্তি করা অভ্যাস করবে। আমি সামান্য মুখখিস্তি করলেই তুমি যদি মুখ কোঁচকাও, আমার বরদাস্ত হবেনা···

'ইয়েস, মিঃ ফে্জার।'

ডড়াম করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো ক্যাথি। উইলিয়ম ফে্জার একটা একগুয়ে, অভদ্র বদমেজাজী লোক। ওর বউ ওকে

ডিভোর্স করে ঠিক করেছে। বস এরকম স্বৈরাচারী হলে কাজ করা যায় কী? অন্য চাকরী খুঁজবে ক্যাথি।

উইলিয়ম ফ্রেজার একা একা হাসছিলেন। এতো সৎ, এতো ভালো মেয়ে। চটে গেছে, চোখ জ্বলছে, ঠোঁট কাঁপছে। এতো অসহায় দেখাচ্ছিল ক্যাথিকে যে ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়েছিলো ফ্রেজারের। সুন্দরী বুদ্ধিমতী, মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা আছে। খুব ভালো সেক্রেটারী হবে। আরো বেশী কিছু হতে পারে? ফ্রেজারের মনের অন্তরালে স্বয়ংক্রিয় বিপদ ঘণ্টা বাজে। একটু পরে যখন ডিকটেশন নিতে আসে ক্যাথি, আগের প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হয়না।

আস্তে আস্তে কাজটা ভালো লেগে যায় ক্যাথির। কতো বড় বড় লোক অনবরত ফোন করছে।

ইউ, এস ভাইসপ্রেসিডেন্ট। এক ডজন সিনেটর। সেক্রেটারী অফ স্টেট। বিখ্যাত চিত্রতারকা। এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট! ফোনটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো ক্যাথির। অ্যাপয়েন্টমেন্ট: রেস্তোরায়, ক্লাবে, রিজারভেশন—দায়িত্ব সব ক্যাথির। ফ্রেজার কার সঙ্গে দেখা করতে চান কার সঙ্গে চাননা বুঝে যায় ক্যাথি। চাকরী ছাড়ার কথা সে ভুলে যায়।

সুসির সঙ্গে বেরোলেই বিবাহিত অ্যাথলিটদের সঙ্গে ডেট দিতে হয়। তার চেয়ে একা একা সিনেমা দেখা ভালো।

অসাধারণ এক নতুন কমেডিয়ান-অভিনেতাকে খুব ভালো লাগে ক্যাথির। অভিনেতার নাম ড্যানি কে। ফিল্ম: লেডী ইন দ্য ডার্ক এবং লাইফ উইথ ফাদার। 'অ্যাসিস ইন আর্মস' ফিল্মে নতুন নায়ক কার্ক ডগলাস। এবং 'কিটি ফয়েল' ফিল্মের হীরোয়িন জিনজার রোজার্স-এর সঙ্গে তার নিজের কতো মিল।

'হ্যামলেট' থিয়েটার দেখতে যেয়ে সে দেখলো, বক্সে অতি-আধুনিক ও দামী সাদা রঙের ইভনিং গাউনপরা রূপসীর সঙ্গে বসে আছেন উইলিয়ম ফ্রেজার। পরের দিন সকালে ডিকটেশনের সময় ফ্রেজার বললেন, 'হ্যামলেট কেমন লাগলো?'

'নাটকটা হিট হবে। তবে অভিনয় ভালো হয়নি।'

'ওফেলিয়াকে তোমার ভালো লাগেনি?'

'সত্যি কথা বলতে কী, জলে ডোবার আগেই তলিয়ে গেছে ওফেলিয়া।'

কাজ বেশী থাকায় একদিন সন্ধ্যায় ফ্রেজার বললেন, ক্যাথি আজ তাঁর বাড়িতে ডিনার খাবে, তারপর ডিকটেশন।

'আপনার বদনাম হবে।'

'একটা উপদেশ দিচ্ছি। কারো সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার ধান্দা থাকলে খোলা জায়গায় করো।'

'ঠাণ্ডা লাগবেনা?'

'মানে আমি বলছিলাম, সে যদি নামজাদা কেউ হয়, তাকে নিয়ে লোকের চোখের সামনে নামজাদা রেস্তোরাঁ বা থিয়েটারে যাও।'

'শেক্সপীয়রের নাটক দেখতে?'

'লোকে বলবে, উনি দেখাচ্ছেন, উনি অমুকের সঙ্গে ঘুরছেন। আসলে কার সঙ্গে ওর গোপন প্রণয়?'

'আইডিয়াটা ভালো।'

'এইভাবে লোক ঠকানোর ব্যাপারে একটা গল্প লিখেছিলেন স্যার আরথার কোনান ডয়েল। নামটা মনে পড়ছেনা।'

'গল্পটা লিখেছিলেন এডগার অ্যালান পো। গল্পের নাম অপহৃত চিঠি।' বলেই ক্যাথির মনে হয়, এতো বেশী স্মার্ট মেয়েদের পছন্দ করেনা পুরুষরা। তবে সে তো ফ্রেজারের সেক্রেটারী, প্রেমিকা নয়।

সারা রাস্তা আর একটা কথা বললেন না ফ্রেজার।

জর্জটাউনে ফ্রেজারের বাড়ি ছবির মতো সাজানো গোছানো, অন্তত দুশো বছরের পুরোনো।

সাদা জ্যাকেট পরা বাটলার দরজা খুলে দিলো।

'থ্যাংকস, ইনিই মিস ক্যাথরিন অ্যালেকজাণ্ডার।'

'হ্যালো, থ্যাংকস আমরা ফোনে কথা বলেছি।'

'ইয়েস, মাদাম। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ পেলাম।'

রিসেপশন হলের মেঝে মারবেলের, ছাদে ঝাড়লণ্ঠন। লাইব্রেরীতে অজস্র বই। রূপোর বালতিতে বরফের মধ্যে মদ। ফরাসী রান্না সুস্বাদু সস্, চেরী জুবিলী।

'খেতে ভালো লাগছে?'

'কমসারীর খাবারের মত নয়।'

'ওখানে একদিন যেতে হবে।'

'না, মেয়েরা ভিড় করবে। আপনার ব্যাপারে এদের দারুণ আগ্রহ।'

'তুমি কী বলো?'

'বলি, আপনি ডিক্টেশনের সময় হাতে লোডেড রাইফেল রাখেন। যে কোনো সময় গুলি ছোটার ভয় থাকে।'

'আসলে আমি কেমন, তুমি জেনেছো?'

'আমি কেমন?···যাকগে ডিক্টেশন শুরু করা যাক।'

ক্যাথরিন ঘরে ফিরতে সুসি জিজ্ঞেস করে, 'বস শুতে চেয়েছিলো?'

'নাতো।'

'আমি জানি, ভারজিন মেরীর মতো রূপ দেখে সাহস করেনি বস। যদি তুমি বলাৎকার, ধর্ষণ বলে চেঁচিয়ে ওঠো।'

··· কুমারী মেরী নয়, সেন্ট ক্যাথরিন। ওয়াশিংটনে এসেও কুমারী জীবন বদলানো গেলোনা।

শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, ইউরোপ যাচ্ছেন উইলিয়ম ফ্রেজার। অফিসে অনেক কাজ। তবু একা লাগে ক্যাথির।

ভিজিটরেরা আসে, নামজাদা সব পুরুষরা নানা প্রস্তাব করে। লাঞ্চ ডিনার, ইউরোপে বেড়াতে যাওয়া। তার বদলে একসঙ্গে শোয়া। এসব প্রস্তাবে রাজি হয়না ক্যাথি। তার মাইনে সপ্তাহে আর দশ ডলার বেড়েছে।

শহরের জীবনের ধারা পালটে যাচ্ছে। লোকে আরোও দ্রুত হাঁটছে আরোও দুশ্চিন্তা করছে। কেননা খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো বলছে: ফ্যাসিবাদী নাৎসী ডিক্টেটর অ্যাডলফ হিটলারের ঝটিকাবাহিনী হানা দিচ্ছে ইউরোপের দেশে দেশে, নগরে নগরে। প্যারীর পতনে আমেরিকানরা সবচেয়ে অভিভূত। কেননা ফ্রান্স স্বাধীনতার ধাত্রী।

নরওয়ের পতন ঘটেছে। গ্রেট ব্রিটেন প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। জার্মানী ইতালী ও জাপানের ফ্যাসিবাদী জানোয়ারগুলো জোট বেঁধেছে। আমেরিকা জর্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হবে মনে হচ্ছে।

ফ্রেজার বলে, 'আগে না পরে, সেটাই প্রশ্ন। গ্রেট ব্রিটেন যদি ফ্যাসিস্ত হিটলারকে রুখতে না পারে, আমেরিকা রুখবে।'

'কিন্তু সিনেটর বোরা যে বললেন···

'বললেন, আমেরিকা তার নিজের স্বার্থ দেখে বিশ্বযুদ্ধ থেকে তফাতে থাকবে ? বললেন, আমেরিকা প্রথমে, তারপর দুনিয়া। উটপাখী যেমন বিপদ দেখলে বালিতে মাথা গুঁজে ভাবে, সে নিরাপদ, তেমনি বিশ্বযুদ্ধ থেকে দূরে থেকে ওঁরা ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন থেকে নিরাপদে থাকার মিথ্যে আশা করছেন।'

'যুদ্ধ বাধলে আপনি কী করবেন ?'

'হীরো হবো।'

কল্পনায় আমি অফিসারের সুন্দর ইউনিফর্মে বিল ফ্রেজারকে যেন দেখে ক্যাথি।

আইডিয়া তার একদম ভালো লাগেনা।

বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত আধুনিক পৃথিবীর মানুষেরা তাদের বিরোধ মেটাতে পরস্পরকে হত্যা করবে কেন ? ক্যাথি ভাবে। মুখে বলে, 'হিটলার যদি এবার ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে, ইংল্যাণ্ড কিভাবে আত্মরক্ষা করবে ? ইংল্যাণ্ডের তো অতো ট্যাংক বা প্লেন নেই।'

'আমেরিকা দেবে খুব শীগগিরই···

এক সপ্তাহ পরে···

ইংল্যাণ্ডকে সামরিক সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট।

এক সন্ধ্যায় অফিসে বসে ক্যাথিকে কাজ করতে দেখে ফ্রেজার চটে উঠে বললেন, 'এখনও কাজ করছো। সন্ধ্যেটা অন্যভাবে কাটাতে পারো না ?'

'স্যার, এই রিপোর্টটা কাল আপনি সানফ্রানসিসকোয় নিয়ে যাবেন।'

'ক্যাথি, তুমি বলেছিলে, তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে চাও। কাল থেকে তুমি আমার সেক্রেটারী নও, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

'আমি কি বলবো···মিষ্টার ফ্রেজার, আমি চেষ্টা করবো এজন্যে যেন আপনাকে দুঃখ পেতে না হয়।'

'আমি এখনই দুঃখিত। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমায় বিল বলে ডাকবে।'

'বিল।'

বাবাকে অনেকবার ওয়াসিংটনে আসতে চিঠি লিখেছে ক্যাথি। শেষ দুটো চিঠির জবাব না আসায় সে ওমাহা-য় কাকার বাড়িতে ফোন করে। কাকা বলে, 'ক্যাথি, আমি তোমায় ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'বাবা কেমন আছে?'

'ওর স্ট্রোক হয়েছে। আগেই ফোন করতাম। ও বারণ করছিলো'।

'এখন ভালো আছে?'

'না' ক্যাথি, পক্ষাঘাত হয়েছে।'

'আমি যাচ্ছি।'

খবরটা বিল ফ্রেজারকে দিতে উনি বললেন, 'আমি দুঃখিত। কোনো সাহায্য করতে পারি?

'জানিনা। আমি এখনই যাচ্ছি, বিল।'

'নিশ্চয়ই।' বিল ফোন তোলে। বিলের গাড়ী তাকে প্রথমে ফ্ল্যাটে, তারপর এয়ারপোর্ট নিয়ে যাবে।

ওমাহা এয়ারপোর্টে কাকা-কাকীমার মুখ দেখেই ক্যাথি বোঝে, বাবা নেই।

কফিনে শুয়ে আছে ক্যাথরিনের বাবা। সময় তার শরীর শুকিয়ে ছোট করে দিয়েছে। ক্যাথির জন্য রেখে গেছে এক জীবনের নিষ্ফল যতো স্বপ্ন, পঞ্চাশ ডলার, ক্যাথির ছবি, ক্যাথির চিঠি।

মানুষটার স্বপ্ন যতো বড়ো ছিল, সাফল্য তত কম। পকেট ভর্তি পয়সা আর উপহার নিয়ে ছোট্ট মেয়ের কাছে ফিরে আসতো উচ্ছল, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষটা। কতো কি আবিষ্কার করতো, কোনোটা—কাজে আসতোনা।

এখন শুধু স্মৃতি।

মানুষটার জন্য কত কী করতে চেয়েছিলো ক্যাথি। কিছুই করা হলোনা।

চার্চের পাশে বাবাকে কবর দিয়ে পরের প্লেনে ওয়াশিংটনে ফিরে গেলো ক্যাথি।

এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিলেন বিল ফ্রেজার।

বাবার সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলতে যেয়ে কেঁদে ফেললো ক্যাথি। অফিসে ছুটি নিতে রাজি হলোনা ক্যাথি। কাজ মানেই কান্না ভোলা, স্মৃতিকে দূরে রাখা। সপ্তাহে দু-একদিন বিলের সঙ্গে ডিনার খায়।

তারপর একদিন রাতে অফিসে তার কাঁধ ছুঁয়ে বলে, 'ক্যাথরিন'।

বিলের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে ক্যাথরিন। প্রথম চুম্বন যেন অভ্যাসের মতো, যেন এই সব ক্যাথির বর্তমান ও অতীতের অঙ্গ।

জর্জটাওনে যেতে যেতে ক্যাথরিনকে জড়িয়ে বসে থাকে বিল। 'ক্যাথি বলে, একটা কথা। আমি কিন্তু কুমারী

'আমি ওয়াশিংটনের একমাত্র কুমারীকে ভালোবেসেছি। তোমার সমস্যাটা কী জানো? ওসব কথা বেশী ভাবতে নেই।'

'না ডারলিং, ভালোবাসাই আসল।'

ডবলবেডে নগ্ন ক্যাথরিন। কালো চুল, সাদা বালিশ, সুন্দর মুখ। ড্রেসিং গাউন খোলে বিল।

'আমি কিছু ব্যবহার করিনা। যদি প্রেগন্যাণ্ট হয়ে যাই…'

'হলেই ভালো।'

মুখ হা হয়ে গেল ক্যাথির। বিলের চুম্বনে মুখটা বন্ধ হয়ে যায়। বিলের শরীরের নিচে ক্যাথির শরীর। অপ্রত্যাশিত একটা ব্যথা অনুভব করে ক্যাথি। তারপর হঠাৎ 'তোমার হয়েছে তো?' বিল-এর জিজ্ঞাসা।

কি হয়েছে বোঝার আগেই শেষবার চাপ দিয়ে স্থির হয়ে যায় ক্যাথি।

বিল ফেজার বলছে, 'ভালো লাগলো? অভ্যাসের সঙ্গে আরো ভালো লাগবে।' এবং ক্যাথি হতাশা চেপে ভাবে, সে যে বিলকে সুখ দিতে পেরেছে, সেটাই বড় কথা। যেন সঙ্গম করাটা হয়তো জলপাই খাওয়ার মতো। প্রথম প্রথম ভালো লাগেনা, অনেকদিন খেতে খেতে ভালো লাগে। বিল ফেজারের আলিঙ্গনে বাঁধা ক্যাথরিন ভাবে নারী পুরুষের পরস্পরকে ভালোবেসে এভাবে কাছে থাকাটাই বড় কথা। পর্ণো উপন্যাস বা প্রেমের গান সত্যি নয়। ওসবের প্রভাবে হয়তো বড্ড বেশী আশা করেছিলো ক্যাথরিন।

সাত

প্যারী, ১৯৪১। সুবিধাবাদীদের কাছে ১৯৪১'র প্যারী ছিলো অর্থ ও সুযোগের স্বর্গ। অন্যদের কাছে ১৯৪১'র প্যারী এক জীবন্ত নরক। যেখানে ফ্যাসীবাদ, সেখানেই নির্যাতন। ১৯৪১'র প্যারীতে কেউ জারমান গেস্টাপোবাহিনীর নাম নিলেই আতংক ছড়াতো। গেস্টাপোদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে লোকে ফিস ফিস করে কথা বলতো। ফরাসী ইহুদীদের ওপর হিটলারের গেস্টাপোদের অত্যাচার প্রথমে ইহুদীদের দোকানের জানালা ভাঙার মতো মামুলীভাবে ছেলেখেলার মতো শুরু হলেও কর্মদক্ষ গেস্টাপোদের নিয়ন্ত্রণে আস্তে আস্তে শুরু হলো ইহুদীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ইহুদীদের জনতার অন্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা, ইহুদীদের হত্যা করা। ১৯৪১'র ২৯শে মে জারমানরা নতুন অর্ডিন্যান্স জারী করলো ঃ..... 'হলুদ কাপড়ে তৈরী হাতের তালুর মতো বড় এবং কালো রেখায় আঁকা তারকাচিত্রের মাঝখানে লেখা থাকবে ইহুদী। ছ'বছরের বেশী বয়সের প্রত্যেক ইহুদীর বুকের বা ধারে পোষাকের উপর এমনভাবে সেলাই করা থাকবে চিহ্নটা, যেন সবাই সহজেই দেখতে পায়।'

যেখানে অত্যাচার, সেখানেই প্রতিরোধ। যেখানে ফ্যাসিবাদ, সেখানেই সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থান। সেখানেই বিদেশী শাসকের শাসন, সেখানেই জাতীয় মুক্তযুদ্ধ। জারমানদের বুটের নিচে নিষ্ক্রিয়ভাবে

পদদলিত হতে রাজি হলোনা ফ্রান্সের বেশীর ভাগ মানুষ। ফরাসী 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' প্রতিরোধবাহিনী কৌশলে যুদ্ধ চালাচ্ছিলো, ধরা পড়লে গেস্টাপোরা' নিষ্ঠুর অত্যাচার করে তাদের হত্যা করতো। এক যুবতী কাউনটেসের প্রাসাদের নিচের তলা দখল করেছিলো জারমান বাহিনী। অথচ ওঁর প্রাসাদের ওপরতলায় লুকিয়ে আছে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' প্রতিরোধবাহিনীর পাঁচজন ফরাসী মুক্তিযোদ্ধা। দুই বাহিনীর কখনো মুখোমুখি দেখা না হলেও তিন মাসে কাউনটেসের মাথার কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গেলো দিবারাত্রি দুশ্চিন্তার ফলে।

বিজয়ী বাহিনীকে যেমন মানায়, তেমনি ভাবেই রইলো জারমানরা। কিন্তু ফরাসীদের জন্যে শীত ও যন্ত্রণা ছাড়া সবকিছুরই অভাব। রান্নার গ্যাস পর্যন্ত রেশন করা হয়েছে। ঘর গরম করার উপায় নেই। টন-টন কাঠের গুঁড়ো কিনে ফরাসীরা বাড়ীর অর্ধেক কাঠগুঁড়োয় ভরে রেখে বাকী অর্ধেক বিশেষ ধরনের স্টোভ জেলে গরম করতো। সব কিছুই দারুণ আক্রা। ফরাসীরা ঠাট্টা করতো, যাই খাও, স্বাদ একইরকম। ফরাসী মেয়েরা দুনিয়ার যে কোনো দেশের মেয়েদের তুলনায় অনেক স্মার্ট, অনেক ফ্যাশনদুরস্ত। কিন্তু তারা এখন পশমের কোটের বদলে ভেড়ার লোমের সস্তা বিশ্রী কোট পরছে এবং তাদের পায়ে এখন কাঠের উঁচু হিল লাগানো জুতো, ফলে প্যারীর রাস্তায় মেয়েরা হাঁটলে ঘোড়ার খুরের শব্দের মত বিশ্রী আওয়াজ হয়।

কোনো জাতির জীবনে দীর্ঘস্থায়ী সংকট নেমে এলেই জাতীয় নাট্যশালা বিচলিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব বিভীষিকার চাকা থেকে অব্যাহতি পেতে প্যারীর মানুষ থিয়েটার ও সিনেমাহলে ভীড় করে।

রাতারাতি মস্ত বড় মঞ্চতারকা হয়েছে হেলেন পেইস। ঈর্ষাতুর প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলে, এসবই অসাধারণ শক্তিশালী ও প্রতিভাবান পরিচালক আরমাঁদের অবদান। কিন্তু আরমাঁদ হেলেনকে মঞ্চে নামালেও থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই জানে যে অভিনেত্রীকে তারকায় পরিণত করতে পারে শুধুমাত্র জনতা, সেই নামহীন, অবয়বহীন, ক্ষণপরিবর্তনশীল মেজাজের জনসমষ্টি যাদের বিচারে নির্ধারিত হয় অভিনেতা অভিনেত্রীর ভাগ্য।

হেলেনকে থিয়েটারে চান্স ছিয়েছে বলে এক একসময় অনুতাপও হয় পরিচালক আরমাঁদের। এখন আর ওর জীবনে আরমাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু খেয়ালের বশেই হেলেন এখনো আছে আরমাঁদের সঙ্গে এবং একদিন আরমাঁদকে ছেড়ে যাবেই ও। সেই দিনটাকে ভয় করে আরমাঁদ। সারাটা জীবন থিয়েটারে কাজ করলেও আজ অবধি আরমাঁদ হেলেনের মতো কোনো অভিনেত্রীকে দেখেনি। অভিনয় সম্বন্ধে জানার কী প্রচণ্ড পিপাসা হেলেনের! যতো শেখাচ্ছে আরমাঁদ ততো বেশী শিখতে চাইছে হেলেন। নাটকের চরিত্রের গভীরে হেলেনের সহজ বিচরণ অবাক বিস্ময়ে দেখে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালক আরমাঁদ।

সে প্রথমেই বুঝেছিলো, হেলেন শুধু অভিনেত্রী নয়, তারকা হবে। প্রতিভা কাকে বলে প্রতিভাবান পরিচালক আরমাঁদ জানে। কিন্তু কী আশ্চর্য তারকা হওয়া এই অভিনেত্রীর জীবনের লক্ষ্য নয়। আসলে অভিনয় সম্বন্ধে এতো শিখলেও অভিনয় ভালোবাসেনা হেলেন। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো আরমাঁদের। মঞ্চ বা ফিল্মের তারকা হওয়া যে কোনো অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবনের চরম ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু ওর আসল লক্ষ্য কী, কিছুতেই বুঝতে পারছে না আরমাঁদ।

তার চোখে হেলেন অজানা এক রহস্য। এর অতলে যতোই ডুব দিচ্ছে আরমাঁদ, ধাঁধা ততোই বাড়ছে। আরমাঁদের ধারণা, মেয়েদের সম্পর্কে তার দারুণ অভিজ্ঞতা। সে মেয়েদের বোঝে। অথচ যে মেয়ে তার সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে তার মনের রহস্য সে বুঝতে পারছে না। ওর 'হ্যাঁ' কথাটার কোনো দাম নেই। ফরাসী মঞ্চের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা ফিলিপ সরেইলের বিয়ের প্রস্তাব উপেক্ষা করে যে আরমাঁদের কাছে চলে এসেছে, সে এর আগে কতো পুরুষকে এভাবে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে ঈশ্বরই জানেন, তার কাছে আরমাঁদের এই বিয়ের প্রস্তাবের কোনো দাম নেই। আরমাঁদ জানে, হেলেনের সঙ্গে তার বিয়ে হবেনা। প্রয়োজন ফুরোলে আরমাঁদকেও ছেড়ে যাবে ও। আরমাঁদ জানে, অনেক পুরুষ তাকে ঈর্ষা করে, সবাই হেলেনকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায়, কিন্তু কেউই সুযোগ পায়না।

প্রথম যে নাটকে আরমাঁদ ওকে নায়িকার ভূমিকা দিয়েছিলো, সেই নাটকের প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার স্বামী যুদ্ধে গেছে। রাশিয়ান ফ্রন্টে ওর স্বামীর সহযোদ্ধা বলে একদিন ওর কাছে নিজের পরিচয় দিলো এক সৈনিক। আসলে সে মানসিক রোগের শিকার বিপজ্জনক এক আততায়ী। তাকে ভালোবেসে ফেললো মেয়েটি। তার জীবন যে বিপন্ন সে একবারও বুঝলো না। এই মেয়েটির ভূমিকায় হেলেনের অভিনয় দেখে আরমাঁদ খুশি হয়ে ঠিক করলো, ওকেই নায়িকার ভূমিকায় নামানো হবে নাম-না-জানা অভিনেত্রীকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়ায় আপত্তি করলো ব্যাংকার। তারই টাকায় প্রোডাকশন। সুতরাং তাকে রিহার্সালে ডাকলো আরমাঁদ। হেলেনের অভিনয় দেখে সেও মুগ্ধ। সুবখরটা ওর বাড়ি গিয়ে শোনাতে চেয়েছিলো আরমাঁদ। ভেবেছিলো, হেলেন

তারকা হতে চেয়েছিলো, তার ইচ্ছা পূরণ করেছে আরমাঁদ। এখন ওরা দুজনে পরস্পরের আরো কাছে আসবে। এখন আরমাঁদকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসবে ও। হেলেনকে বিয়ে করবে আরমাঁদ। তাহলে ও কোনোদিন তাকে ছেড়ে যেতে পারবেনা। কিন্তু আরমাঁদ সুখবরটা দিতে হেলেন শুধু বললো, 'খুব ভালো। ধন্যবাদ, আরমাঁদ।' ঘড়ির সময় বললে বা সিগারেট ধরিয়ে দিলে যেভাবে ধন্যবাদ দেয় সচরাচর হেলেন। আরমাঁদ বুঝেছে, হেলেনের ভেতরে অদ্ভুত এক অসুখ, ওর অস্তিত্বের অন্তরালে কী একটা অনুভূতি যেন মরে গেছে এবং ও কখনো কোনদিন কারো আপনজন হতে পারবে না। কিন্তু ও সুন্দরী, ও তাকে সুখ দেয়, তার সব খেয়াল মেটায়, কিন্তু, প্রতিদানে কিছু চায়না। এবং তাই ওকে ভালোবেসে ফেলেছে আরমাঁদ।

দুমাস পরে প্যারীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু হলো, রাতারাতি ফ্রান্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় মঞ্চ তারকায় পরিণত হলো হেলেন পেইস। আরমাঁদ তার প্রেমিকা নতুন এক অভিনেত্রীকে গায়ের জোরে এই নাটকের নায়িকা বানিয়েছে বলে সমালোচকদের রাগ ছিলো। কিন্তু নাটক দেখে তারা মুগ্ধ। ওর রূপ, অভিনয়, প্রতিভা সবকিছুর যেন সঠিক বর্ণনা করতে পারছে না সমালোচকরা। নাটকটা সফল হলো। অভিনয়ের পর, প্রতিরাতে হেলেনের ঘর ভিজিটরে ভরে যায়। আসে কেরাণী ও সৈনিক কোটিপতি ও সেলসগার্ল, সবারই সঙ্গে দেখা করে হেলেন। আরমাঁদের মনে হয়, যেন রাজকন্যা প্রজাদের সঙ্গে দেখা করছে। মার্সেই থেকে এ সময়ের লাঁশার তিনটে চিঠি এলো। না খুলেই ছুঁড়ে ফেলে দেয় হেলেন। আর কোন চিঠি আসে না।

সেই বসন্তে আরমাঁদের পরিচালনায় প্রথম ফিল্মে নামলো হেলেন। ন্যুভেল ভাগ ফিল্ম আন্দোলনের এক পথিকৃৎ আরমাঁদ। হেলেনের

অভিনয় প্রতিভারও তুলনা নেই। দারুণ হিট হলো ফিল্ম। ওর নাম ছড়িয়ে গেলো সারা ইউরোপে। আরমাঁদ অবাক হয়ে দেখে, কত যত্নের সঙ্গে ম্যাগাজিনের রিপোর্টারের কাছে ইন্টারভিউ দিচ্ছে হেলেন। কতো আগ্রহের সঙ্গে ফটো দিচ্ছে। অন্য চিত্রতারকারা নাম প্রচারের লোভে এসবে রাজি হলেও তারা ক্লান্ত, বিরক্ত বোধ করে। বর্ষার ঠাণ্ডায় প্যারী ছেড়ে ফ্রান্সের দক্ষিণে ছুটি ও বিশ্রামের সুযোগ ছেড়ে দিলো হেলেন। কেন? লে ম্যাতিঁ, লা পেতিৎ প্যারিসিয়েনে এবং লা ইলাসট্রেসঁ তার ইনটারভিউ ও ফটো ছাপবে বলে। কিন্তু আরমাঁদ জানেনা আসল কারণটা। জানলে চমকে উঠতো আরমাঁদ।

হেলেন যা কিছু করে ল্যারী ডগলাসের জন্যে।

ল্যারী ডগলাস ফিরে আসবে হেলেনের জীবনে। হেলেন প্রতিশোধ নেবে। ল্যারীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ।

ম্যাগাজিনের ফটোর জন্য যখন সে পোজ দেয়, সে স্বপ্ন দেখে ম্যাগাজিন খুলে তার ফটোটা চিনতে পেরেছে ল্যারী। ফিল্মের কোন দৃশ্যে সে যখন অভিনয় করে, সে কল্পনায় দেখে, দূরের কোনো দেশে সিনেমা হলে বসে ওই দৃশ্যটা সিনেমার পর্দায় দেখছে ল্যারী ডগলাস। ল্যারীর মনে পড়বে অতীতের কথা। ল্যারী একদিন ওর কাছে ফিরে আসবে। তখন ওর সর্বনাশ করবে হেলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ক্রিশ্চিয়ান বারবেৎ-এর জন্যে ল্যারীর সম্বন্ধে সব খবরই জানতে পারছে হেলেন। এখন রু্য রিশারে বড় ফ্ল্যাটে অফিস করেছে ডিটেকটিভ। ওগুলো আগে ইহুদীদের সম্পত্তি ছিলো। নাৎসী জারমানদের নাকের ডগার সামনে ইংল্যাণ্ড থেকে খবর জোগাড় করা শক্ত। ডিটেকটিভ নিরপেক্ষ জাহাজের নাবিকদের ঘুষ দিয়ে লণ্ডনের এজেন্সী থেকে চিঠি আনায়।

ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে প্লেন ওড়ানোর সময় তোমার বন্ধুর প্লেনে জারমানদের গুলি লাগে, খবরটা দিয়ে তেরচা চোখে হেলেনকে লক্ষ্য করেছিলো গোয়েন্দা। আশা করছিলো, ওর মুখে যন্ত্রণার রেখা ফুটবে।

কিন্তু, ওর চেহারা ভাবলেশহীন। শুধু বলে, ও বেঁচে গেছে।'

গোয়েন্দা ঢোক গিলে বলে, 'হ্যাঁ', ব্রিটিশ নৌকা ওকে উদ্ধার করে।' গোয়েন্দা মনে মনে ভাবে, মেয়েটা জানলো কী করে? সে আরো বলে, 'এখন ওর স্কোয়াড্রন লিংকনশায়ারে। ও এখন হারিকেন বিমানের পাইলট...'

ওর কথায় কান না দিয়ে হেলেন বলে, অ্যাডমিরালের সেই মেয়ের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে গেছে, তাই না?'

আবার অবাক হয় গোয়েন্দা। তার কথা জড়িয়ে যায়। 'হ্যাঁ, অ্যাডমিরালের মেয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ল্যারীর ফষ্টিনষ্টির ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিলো।'

একদিন রাতে অভিনয় শেষ করে ড্রেসিংরুমে মেক আপ মুছছে হেলেন। দারোয়ান মারিয়াস চার ডজন চুণীর মতো লাল, শিশিরভেজা গোলাপ নিয়ে এলো, ফুলদানিসমেত। ফুলদানিটা সুন্দর এবং দামী। সঙ্গের কার্ডে লেখা, 'সুন্দরী মিস পেইসকে। আপনি কী আমার সঙ্গে নৈশভোজ খাবেন?'—জেনারেল হ্যানস শেইডার দারোয়ান বললো, 'উনি জবাব চাইছেন।'

হেলেন জারমানদের সঙ্গে কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়তে চায়না। সে বলে, 'জেনারেলকে বলো, আমি কখনো নৈশভোজ খাইনা। ফল এবং ফুলদানি নিয়ে ওঁর স্ত্রীকে পাঠালে ভালো হয়।'

মারিয়াস ফুলদানি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলো। হেলেন জানে, গল্পটা এখন সবাইকে শোনাবে দারোয়ান। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। ফরাসী জনতার চোখে, হেলেন ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক জারমান বিদ্বেষী এক নায়িকা। ব্যাপারটা হাস্যকর। আসলে নাৎসীদের সম্বন্ধে ভালোমন্দ কিছুই ভাবেনা ও। তার জীবনের পরিকল্পনায় ওদের কোনো ঠাঁই নেই। সে ওদের সহ্য করে সে অপেক্ষা করে সেই দিনটার জন্যে, যখন ওরা বাড়ি ফিরে যাবে। বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ বড়।

যেখানে পরদেশ আগ্রাসন, সেখানেই মুক্তিসংগ্রাম। স্বৈরাচার কখনো চিরস্থায়ী হয়না। জার্মানরা হারবে, নাৎসীদের ফ্রান্স ছেড়ে যেতে হবে। এবং, আজ যদি জার্মানদের সঙ্গে দহরমমহরম করে হেলেন, কাল তার দেশবাসীরা তাকে ঘৃণা করবে আরমাঁদ বলে, 'নাৎসীরা ফ্রান্স অধিকার করেছে, এ নিয়ে তুমি একটুও ভেবোনা। সবাই এরকম ভাবলে আমরা জ্বলতে থাকবো

'আমরা তো এমনিতেই জ্বলছি।'

'তুমি কী মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করোনা? তোমার ধারণা যে জন্মমুহূর্ত থেকেই আমাদের নির্দিষ্ট হয়ে যায়?'

'কিছুটা শরীর, জন্মস্থান, জীবনে আমাদের নির্দিষ্ট স্থান, এসব তো নির্ধারিত হয়ে যায় জন্মমুহূর্তেই। কিন্তু মানুষ তার নিয়তি বদলাতে পারে। মানুষ যা হতে চায়, তাই হতে পারে।'

'ঠিক তাই। সুতরাং আমাদের নাৎসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।'

অক্টোবর মাসে হেলেনের নাটকের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এলো অভিনেতা, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী অধিকাংশ ফরাসী বান্ধবীদের সঙ্গে কয়েকজন জার্মান

অফিসার। তাদের একজনের কোন সঙ্গিনী নেই। বয়স চল্লিশের কোঠায়। তাঁর দীল মুখে বুদ্ধির ছাপ। গাঢ় সবুজ দুচোখ। একাহারা শরীর এবং গলা থেকে চোয়াল অবধি সরু এক ক্ষতের দাগ। কাছে না এসেও তার দিকে তাকিয়ে আছে জার্মান অফিসার। হেলেন জিজ্ঞেস করে, 'উনি কে?'

'নাৎসী জেনারেল হ্যানস শেইডারকে তুমি চেনোনা? আমরা তো ভেবেছিলাম উঁনি তোমার বন্ধু। জার্মান সেন্সর কর্তৃপক্ষ তোমার নতুন ছবিটা সম্বন্ধে আপত্তি তুললে জেনারেলের ব্যক্তিগত নির্দেশে তা ছাড়া পায়।' জবাব দেয় আরমাঁদ।

পরের দিন সন্ধ্যায় অভিনয়ের পর ড্রেসিংরুমে ঢুকে হেলেন দেখে, ছোট্ট ফুলদানিতে একটা মাত্র গোলাপ ও সঙ্গের ছোট্ট কার্ডে লেখা, 'ছোট থেকেই শুরু করা ভালো। তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?' —হ্যানস শেইডার। কার্ড ছিঁড়ে ফুলসহ ওয়েষ্ট পেপার বাক্সে ফেলে দেয় হেলেন।

সে রাত থেকেই ও খেয়াল করে, যে পার্টিতেই সে আর আরমাঁদ যায়, সেখানেই নোয়েল হ্যানস শেইডারও হাজির। কাছে আসেন না। দূর থেকে দেখেন হেলেনকে।

যেখানে ফ্যাসিবাদ, সেখানেই প্রতিবাদ। যে কেউ তাদের বিরোধিতা করলে নাৎসী গেষ্টাপোর হাতে কঠোর শাস্তি পায়। কিন্তু নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ থামানো যায় না। স্যাবোটাজ, মুক্তিযোদ্ধার প্রধান অস্ত্র। ফরাসী 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' প্রতিরোধবাহিনীর মূল শাখা ছাড়াও লড়ছে স্বাধীনতা প্রেমিক সশস্ত্র ছোট ছোট গ্রুপ। জার্মান সৈনিক অসাবধান হলেই খুন হয়। নাৎসীদের মালবাহী ট্রাক

বোমায় উড়ে যায়। মাইনের বিস্ফরণে উড়ে যায় সেতু ও সেনাবাহি ট্রেন। সংবাদপত্র এসবের নিন্দা করে। কিন্তু দেশপ্রেমিক ফরাসীদের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা মহান সংগ্রামী বীর।

মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট এক গ্রুপের নেতার কথা প্রায়ই ছাপা হয় খবরের কাগজে। জার্মানরা ওর নাম দিয়েছে 'আরশোলা'। ওকে সর্বত্র দেখা যায়। আঘাত হেনেই ও দ্রুত পালিয়ে যায়। গেস্টাপো বাহিনীও ওকে খুঁজে বের করতে পারছে না। কেউ বলে, ও প্যারী প্রবাসী ইংরেজ দেশপ্রেমিক। কেউ বলেছে, ও নাৎসীবিরোধী গণতন্ত্রপ্রেমিক জার্মান। প্যারীর দেয়ালে দেয়ালে আরশোলা আঁকা। গেস্টাপো বাহিনী প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওকে ধরবার জন্যে। একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই, 'আরশোলা' ফরাসী জনগণের বিপ্লবী নায়ক।

ডিসেম্বরের এক বৃষ্টিভেজা বিকেলে তরুণ এক শিল্পীর পেনটিং-এর একজিবিশনে যায় হেলেন। হঠাৎ কে ওর হাত ছোঁয়। ফিরে তাকিয়ে হেলেন দেখে, মাদাম রোজ। পরিচিত কুৎসিত মুখ যেন আচমকা বুড়ো হয়ে গেছে। পরণে ঢিলে কালো পোষাক। হেলেনের খেয়াল হয়, নাৎসীদের নির্দেশমাফিক 'ইহুদী'-লেখা কালো তারার হলুদ কাপড় বুকে লাগায়নি তো মহিলা। ফিসফিস করে বলে মাদাম রোজ, 'লে দ মাগটস্-এ দেখা করো।'

তারপর ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায় মহিলা। ফটোগ্রাফাররা হেলেনের ছবি তুলেছে। ফরাসী ফিল্ম ও মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেত্রীর ছবি। হেলেন ভাবছে, তার জীবনের একটা দুঃসহ মুহূর্তে মাদাম রোজ তাকে সাহায্য করেছিলেন এবং মাদামের আত্মীয় ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ্‌নেবার তার জীবন বাঁচিয়েছে। এখন কী চায় মাদাম রোজ? খুব সম্ভব, টাকা চাইবে।

ট্যাক্সি থামে লেদী মাগটস্-এর সামনে। ট্যাক্সি থেকে নামে হেলেন। বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা। এরই মধ্যে রেনকোট ও মস্ত বড় টুপি পরা একটা লোক ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ! হঠাৎ যেন বয়স বেড়ে গেছে যুবক ডাক্তারের। মুখে কর্তৃত্বের ভাব এসেছে। আরো রোগা হয়েছে ডাক্তার। চোখ বসা, যেন অনেক দিন ঘুমোয়নি। ওর বুকে 'ইহুদী' লেখা হলুদ কাপড়ের কালো তারা নেই। ওরা কাফের ভেতরে ঢোকে।

'ড্রিংকস্?'

'না, ধন্যবাদ।'

'হেলেন, আমি তোমার ফিল্ম ও নাটক দেখেছি। তোমার অভিনয় অপূর্ব।'

'স্টেজের ব্যাকরুমে দেখা করোনা কেন?'

'আমি ইহুদী, তোমার অসুবিধা হতে পারতো।'

হেলেন ভাবে, 'ইহুদী' একটা শব্দ, শুধুমাত্র একটা শব্দ' যা খবরের কাগজে মাঝেমাঝে দেখা যায়। অথচ নাৎসীরা যখন ইহুদী নিধনে বদ্ধপরিকর তখন ইহুদী হয়ে এই দেশে বেঁচে থাকা নিজের মাতৃভূমিতে প্রবাসী হয়ে থাকা, কতো কষ্টের, কতো যন্ত্রণার! হেলেন বলে, 'আমার বন্ধু আমি বাছবো, অন্য কেউ নয়।'

'যেখানে সাহস দেখালে লাভ হয়, সেখানে সাহস দেখানোই ভালো।'

'তোমার কথা বলো।'

'আমি হার্ট সার্জন ডক্টর অাঁজিবুসৎ-এর সহকারী ছিলাম। নাৎসীরা আমার লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে বললো, প্র্যাকটিস করতে পারবে না। আমি ডাক্তার কিন্তু, বাধ্য হয়ে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ শিখলাম।'

'শুধু কী তাই ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলে কেন ?'

'সাহায্যের আশায়। একজন বন্ধু···'

সেই মুহূর্তে কাফের দরজা খুলে ভেতরে এলো জারমান করপোর‍্যাল এবং নাৎসী বাহিনীর ধূসর সবুজ ইউনিফর্মপরা চারজন সৈনিক।

'তোমাদের আইডেনটিটি-পেপার্স দেখবো।'

ওভারকোটের ডান পকেটে হাত। শরীর শক্ত হয়ে গেছে। মুখ মুখোসের মতো। ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ্ বলে, 'হেলেন, যাও। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। এখন···'

'কেন ?'

'প্রশ্ন করোনা। এখনই যাও ?'

হেলেন একটু ইতস্তত করে দরজার দিকে তাকায়। ইজরায়েল চেয়ার নাড়াতেই ওর দিকে যায় দুজন জার্মান সৈনিক। বলে 'আইডেনটিটি পেপার্স দেখাও।' হেলেন কিভাবে যেন বুঝে গেলো, আসলে ইজরায়েলকেই অ্যারেস্ট করতে এসেছে জার্মান সৈনিকরা। ইজরায়েলকেই খুঁজছে ওরা। পালাবার চেষ্টা করলেই ও মরবে। আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে হেলেন, 'ফ্রাঁসোয়া! থিয়েটারে যেতে দেরী হয়ে যাবে। বিল মিটিয়ে তাড়াতাড়ি চলো।'

সৈনিকেরা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ইজরায়েলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেলেন। জারমান করপোর‍্যাল বলে, 'উনি আপনার সঙ্গে এসেছেন, মিস ?'

'নিশ্চয়ই, ফরাসী নাগরিকদের বিরক্ত করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তোমাদের ?'

'সরি, মিস কিন্তু···

'আমি মিস নই, আমি হেলেন পেইস। আমি ভ্যারাইটি থিয়েটারের নায়িকা। আমার এই বন্ধু আমার সহ অভিনেতা। আজ রাতে আমার প্রিয় বন্ধু জেনারেল হ্যানস শেইডারের সঙ্গে নৈশভোজের সময় এই সব কথা বলে দেবো···

'আই অ্যাম সরি। আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার বন্ধুকে তো চিনলাম না ?'

'তোমরা বর্বরগুলো নাটক দেখলে তবে তো চিনবে। আমাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। যাতে না যেতে পারি ?'

'না, না, অ্যারেস্ট করা হবে কেন ? অসুবিধে হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত।'

এবার ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ ছেদ করে বলল, 'করপোর‍্যাল, বাইরে বড্ড বৃষ্টি। একজন সৈনিককে যদি বলেন ট্যাক্সি ডেকে দিতে।'

'নিশ্চয়ই। এখুনি ডাকছি।'

ওরা দুজন ট্যাক্সিতে ওঠে। তিন ব্লক পেরিয়ে ট্রাফিকের লাল আলোর সংকেতে ট্যাক্সি থামলে ইজরায়েল হেলেনের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে নিঃশব্দে নেমে যায় ট্যাক্সি থেকে।

সেদিন সন্ধ্যা ৭টায় ড্রেসিংরুমে ঢুকে হেলেন দেখে, যুবক করপোর‍্যালের পাশে নির্লোম, ধবধবে সাদা, লালচোখওলা গেস্টাপোকর্নেল এসে বসে আছে। 'মিস হেলেন পেইস ? আমি গেস্টাপোর কর্নেল কুর্ট মুয়েলার। এই করপোর‍্যালের সঙ্গে আজই আপনার দেখা

হয়েছিলো কফিহাউসে। আপনার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলো। করপোর‍্যালকে আপনি বলেছিলেন যে থিয়েটারে ওই বন্ধু আপনার সহ অভিনেতা। এখন থিয়েটার দেখতে এসে করাপার‍্যাল দেখলেন, ছবিতে অভিনেতাদের ফটোর মধ্যে আপনার সেই বন্ধুর ফটো নেই। তখন ও আমাকে ফোন করে। লোকটা কে? তার নাম কী?'

'আমি জানিনা, কর্নেল। কাফের বাইরে অচেনা লোকটা আমায় বলে যে মুদীর দোকান থেকে বউ বাচ্চার জন্য সামান্য কিছু চুরি করার অপরাধে সৈনিকেরা তাকে খুঁজছে। আমি ভাবলাম, আহা, বেচারা! তাই ওকে সাহায্য করেছিলাম।'

'মাদমোয়াজেল পেইস, সত্যিই আপনি বড় অভিনেত্রী। আপনাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি। আমরা জার্মানরা ফরাসীদের সাহায্য ও বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু শত্রুর বন্ধু আমাদের শত্রু। মাদমোয়াজেল, আপনার বন্ধু ধরা পড়বে। সে সব স্বীকার করবে।'

'আমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'আছে। আমি আছি। সুতরাং আছে। বন্ধুর খবর কিছু পেলে নিশ্চয়ই আমায় জানাবেন। নাহলে···

ওরা চলে গেলো। গেস্টাপো! হেলেনের বুকে জাগে ভয়ের শিহরণ। গেস্টাপো যদি ইহুদী ডাক্তার ইজরায়েল কাৎজকে ধরতে পারে। ইজরায়েল যদি বলে, হেলেন তাকে আগেই চিনতো। কিন্তু, তাও এতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যদি না···রেস্তোরাঁয় শোনা একটা নাম মনে পড়ে যায় হেলেনের। ডক্টর ইজরায়েল কাৎজই কী সেই দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধা, আরশোলা!!!

মুক্তিযুদ্ধ মানুষকে বদলায়। ডাক্তারও যদি দেশকে মুক্তির জন্যে হাতে তুলে নেয় বোমা ও রাইফেল...। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল হেলেন।

অথচ আধঘণ্টা, পরে স্টেজে নেমে হেলেন নাটকের চরিত্র ও ঘটনা ছাড়া আর সব কিছু ভুলে গেল। দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ। দর্শক অভিনন্দনের মধ্যেই স্টেজ থেকে নেমে ড্রেসিংরুমে ঢুকে হেলেন দেখে চেয়ারে বসে আছেন জেনারেল হানস শেইডার। 'শুনলাম, আজ সন্ধ্যায় আমাদের একসাথে নৈশভোজ খাওয়ার কথা আছে।'

জেনারেলের চকচকে, কালো লিম্যুসিন গাড়ী চালাচ্ছে ড্রাইভার। প্যারী শহরের কুড়ি মাইল দূরে সেইন নদীর তীরে লে ফ্রুৎ পারদীতে সান্ধ্যভোজ। বৃষ্টি নেমেছে। ঠাণ্ডা অথচ সুন্দর রাত। খাওয়া শেষ হলে জেনারেল বললেন, 'গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্স ফোনে জানতে চেয়েছিলো, সত্যিই কী আমাদের একসঙ্গে নৈশভোজ খাওয়ার কথা আছে। আমি 'না' বললে আপনার বিপদ হতো। তাই 'হ্যাঁ' বললাম।'

'কী আশ্চর্য। মুদীর দোকানে সামান্য কী চুরি করেছে লোকটা...

'না। ভুল করবেন না। সব জার্মান নির্বোধ নয়। এবং গেস্টাপোর ক্ষমতা আছে।'

'আমি তো কিছুই করিনি, জেনারেল।'

'কর্ণেল কুর্ট মুয়েলারের ধারণা, এমন একজন লোককে আপনি পালাতে সাহায্য করেছেন, যাকে অনেক দিন ধরে ধরতে চাইছে গেস্টাপো। সেক্ষেত্রে ঝামেলা হবে। কেননা কর্ণেল মুয়েলার কোনো কিছু ভোলেনা, ক্ষমাও করেনা। অবশ্য আপনি যদি আর ওই বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করেন কোনো ঝামেলা হবে না। কনিয়াক খাবেন?'

ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিয়ে জেনারেল বললেন, 'আমার সঙ্গে সেদিন ডিনার খেতে রাজি হলেন না কেন? আরমাঁদ রাগ করতে পারে ভেবে?'

'না। প্যারীতে তো সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই। আপনি ইচ্ছে করলে তাদের কাউকে...'

'বারলিনে আমার স্ত্রী-পুত্র আছে। তাদের আমি ভালোবাসি। তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানিনা।'

'কে আপনাকে প্যারীতে আসতে বাধ্য করেছিলো?'

'আমি সহানুভূতি জানাতে বলছিনা। নিজের কথা বুঝিয়ে বলতে চাই। আমি উচ্ছৃঙ্খল, দুশ্চরিত্র স্বভাবের পুরুষ নই। স্টেজে প্রথম দিন আপনাকে দেখে আমার কিছু একটা হয়েছে। আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি।'

'আমি কোনো কথা দিতে পারবো না।' ধীর কণ্ঠে বললো হেলেন।

জারমান মানেই বর্বর নয়। জলপাই সবুজ ইউনিফর্মপরা এই অফিসার সৈনিক না হয়ে শিক্ষক হলেই যেন মানাতো। ভদ্র, বুদ্ধিমান রসিক। অথচ গালের ওই ক্ষতচিহ্ন?

'ক্ষতচিহ্নটা কী করে হলো?'

'অনেক বছর আগে ডুয়েল লড়েছিলাম। জারমান ভাষায় ক্ষত-চিহ্নের নাম, স্বকের অহংকার।' নীৎসের দর্শনের কথা বলছে জেনারেল শেইডার। 'আমরা দৈত্যদানব নই। আমরা বিশ্ববিজেতা হতে চাইনা। কিন্তু কুড়ি বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী হেরেছিলো, সেই পাপের শাস্তি বসে বসে পাবো, তাও হয়না। ভার্সেই-র সন্ধিচুক্তি এক শৃঙ্খল। জার্মান জনগণ আজ সেই শৃঙ্খল ভেঙেছে।...এতো সহজে ফ্রান্সের পতন হলো কেন জানেন? দোষটা তৃতীয় নেপোলিয়ঁর।'

'ঠাট্টা করছেন ?'

'না। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ঁর সময় ফরাসী গণআন্দোলনে গলিতে গলিতে ব্যারিকেড হচ্ছে দেখে ফরাসী সম্রাট ইনজিনিয়ার ও স্থপতি ব্যারণ ইউজিন জর্জ হাসমানকে হুকুম দিলেন, চওড়া রাস্তা তৈরী করো। সেইসব চওড়া রাস্তা দিয়ে প্যারীতে ঢুকেছে জারমান সেনাবাহিনী। ইতিহাস নগর স্থপতিকে ক্ষমা করবেনা।' এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে হেলেনকে জিজ্ঞেস করে। 'আপনি আরমাঁদকে ভালোবাসেন ?'

'না।'

'আমরা সুখী হতে পারি।'

'আপনার স্ত্রীর মতো সুখী ?'

জেনারেল আহত চোখে তাকায়, 'আমরা বন্ধু হতে পারি। আমাদের মধ্যে শত্রুতা না হয়।'

ভোর তিনটায় ঘরে ফিরে হেলেন দেখলো, আরমাঁদের ঘর লণ্ডভণ্ড। যেন সাইক্লোন বয়ে গেছে ঘরের ভেতরে। ড্রয়ার খোলা, টেবিলের পায়া ভাঙা, কাগজপত্র ছড়ানো। আঁরমাদ বলে, 'গেস্টাপো এসেছিলো। হেলেন তুমি কী করেছ ?'

ইজরায়েল কাৎজ সংক্রান্ত সব ঘটনা বলে যায় হেলেন।

'আমার ধারণা, ওই লোকটাই আরশোলা।'

'মাইগড। আমি জারমানদের ঘেন্না করি। কিন্তু, গেস্টাপোদের মোকাবিলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওই ইহুদীটার নাম, কী যেন বললে ?'

'বলিনি।'

'ও তো তোমার প্রেমিক নয়, ও তোমার কেউ নয়, তুমি আর ওর সঙ্গে দেখা কোরোনা।'

থিয়েটারে যাবার সময়, থিয়েটার থেকে ফেরার সময় হেলেনকে ফলো করছে দুজন গেস্টাপো। জেনারেল ফোন করলেও জবাব দেয়না হেলেন। সে এই যুদ্ধে সুইজারল্যাণ্ডের মতো নিরপেক্ষ। এই পৃথিবীর ইজরায়েল কাৎজরা আত্মরক্ষা জানে। ওদের সঙ্গে জড়াবেনা।...অথচ দুহপ্তা পরেই খবরের কাগজে সামনের পাতার হেডলাইন—আরশোলার গ্রুপের অনেক মুক্তিযোদ্ধা গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু, আরশোলা এখনো পলাতক। হেলেন জানালা দিয়ে দেখে রাস্তায় আলোর নিচে অপেক্ষা করছে কালো রেনকোটপরা দুজন গেস্টাপো।

পরের দিন সকালে সত্তর বছরের ফোকলা বুড়ো দারোয়ান বলে, 'যে কেকটার অর্ডার দিয়েছিলেন, সেটা তৈরী। রু ষ্ত পাসীর বেকারীতে যান।'

'কেক? আমি তো অর্ডার দিইনি।'

'রু ষ্ত পাসী।' একরোখা স্বর দারোয়ানের।

রু ষ্ত পাসীর বেকারীর দরজা খুলে দিলো অ্যাপ্রনপরা মেয়ে মানুষ।

'ইয়েস, মাদমোয়াজেল?'

'আমি বার্থডে কেকের অর্ডার দিয়েছিলাম।'

'কেক তৈরী। এদিকে আসুন।'

যেখানে ফ্যাসিবাদ, সেখানেই প্রতিরোধ। যেখানে প্রতিরোধ, সেখানেই রক্তক্ষয়। বেকারীর পেছন দিকের ঘরে পড়ে আছে একটা রক্ত ও ঘামে ভেজা শরীর। মুখে যন্ত্রণার রেখা। বাঁ হাঁটুতে টুনিকেট বাঁধা। হাটুর কাছে হাড়মাংস গুঁড়োগুঁড়ো।

'কী হয়েছে, ইজরায়েল?' উদ্বিগ্ন করে জিজ্ঞেস করে হেলেন।

'নাৎসীরা আরশোলাকে মাড়িয়েছে, মেরে ফেলতে পারেনি। গেস্টাপো আমার খোঁজে প্যারী শহর চষে বেড়াচ্ছে। আমাকে প্যারী ছেড়ে, ফ্রান্স ছেড়ে পালাতে হবে। একবার লে হাভর-এর বন্দরে পৌঁছুতে পারলে বন্ধুরা আমায় জাহাজ চড়ে পালাতে সাহায্য করবে।'

'কানো বন্ধু যদি তোমায় ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে নিয়ে যায়...।'

'না, রোড ব্লক আছে। একটা ইঁদুরও প্যারী ছেড়ে পালাতে পারবেনা।'

'ওই পা নিয়ে কিভাবে পালাবে?'

'ওই পা নিয়ে পালাবোনা।'

সেই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকলো লম্বাচওড়া দাড়িওলা একটা লোক। তার হাতে ধারালো কুড়ুল।

গেস্টাপো হেলেনকে ধরতে পারলে কী করবে? ও ভাবলো, তারপর বললো, 'পা-টা কাটতে আমি তোমায় সাহায্য করবো।'

আট

ওয়াশিংটন হলিউড, ১৯৪১। বিল ফ্রেজার আরলিংটনের কাছে ছোট্ট এক ফ্ল্যাট জোগাড় করেছে ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডারের জন্যে। ভাড়া কিন্তু ক্যাথরিনই দেয়, বিলকে দিতে দেয় না। পোষাক বা অলংকার উপহার নিলে এতো খুশি হয় বিল যে ক্যাথি না বলতে পারে না। ভালবাসা আছে, তাই যৌনমিলনে নোংরা কিছু নয়, বরং স্বাভাবিক। যদিও ফ্রেজারের সঙ্গে যৌনমিলনে তেমন আনন্দ পায়না ক্যাথি।

ক্যাথিকে ভারজিনিয়ার বাড়িতে নিয়ে যায় বিল ফ্রেজার। হর্স ব্রীডিং ফার্ম। কর্ণেল ফ্রেজারের মাথায় সাদা চুল, চোখ হালকা নীল, বাতে ভোগেন। আর বিলের মাকে দেখলেই অভিজাত পরিবারের মেয়ে বলে মনে হয়। ব্যবহার খুব ভালো। মোমের আলো, শ্বেতপাথরের চুল্লি, রূপোর বাসন, পুরানো মদ, চমৎকার ডিনার। এই জীবনে ক্যাথির হতে পারে। ক্যাথি জানে সে ও ফ্রেজার পরস্পরকে ভালোবাসে। ক্যাথি ভাবে, সিনেমাই সর্বনাশ করছে আমার। প্রেম মানেই গ্যারী কুপার, হামফ্রে বোসার্ট আর স্পেনসার ট্রেসি নয়। কুড়ি বছর পরে বিলকেও ওর বাবার মতো দেখাবে। ক্যাথি ফেরার পথে বলে, 'সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটলো। তোমার মা বাবাকে খুব ভালো লাগলো আমার।'

পরের দিন সন্ধ্যায় উইলিয়াম ফ্রেজার জানালো যে এক সপ্তাহের জন্য তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। আরমিতে যোগ দেবার জন্য যুবকদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে একটা ফিল্ম শুটিং হবে এম, জি, এম স্টুডিওতে। ফ্রেজারের অফিস দেখাশোনার কাজটা ক্যাথরিনের। অন্ধকার সিনেমা হলে বসে হলিউডের তৈরী যাদু ও স্বপ্নের জগতই শুধু এতোদিন দেখেছে ক্যাথরিন। এখন সে দেখছে সত্যিকারের হলিউড। রোদঝলমল রাস্তার দুপাশে পামগাছ, ওয়ারনার ব্রাদার্সের স্টুডিওর ওপরে লেখা, 'ভালো নাগরিক তৈরী হয় এখানে।' গাড়ীতে যেতে যেতে 'স্ট্রবেরীব্লণ্ড' ফিল্মের নায়ক জেমস ক্যাগনী ও 'ভার্ক ভিক্টরী' ফিল্মের নায়িকা বেটি ডেবিসের কথা ভেবে হাসে ক্যাথরিন। হাইল্যাণ্ড এভিনিউ, হলিউড বুলেভার্দ, ইজিপসিয়ান থিয়েটার, গ্রম্যানের চীনে রেস্তোরাঁ পেরিয়ে সানসেট বুলেভার্দ হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থামলে ড্রাইভার বলে—'মিস, হোটেলে ভালো লাগবে আপনার। পৃথিবীর সেরা হোটেল।' সত্যিই তাই। দক্ষিণে পামগাছ ঘেরা বাগানের নামই 'সানসেট'।

ড্রাইভওয়ের রং হাল্কা গোলাপী। ঘর নয়, বাংলো। টেবিলে ফুলের তোড়ার সঙ্গে বিল ফ্রেজারের কার্ড—'তুমি আমার কাছে বা আমি তোমার কাছে থাকলে ভালো হতো। ভালোবাসা নিও।'

বিল ফিল্মের প্রোডাকশনের দায়িত্ব আরমি করপোর্যাল অ্যালান বেনজামিনের। সে ফোন করে বলে, 'ওয়েলকাম, মিস ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডার। কাল সকালে ক্যালভার সিটিতে এম, জি, এম স্টুডিওতে তোমার নম্বর ফ্লোরে শুটিং শুরু হবে।'

মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার স্টুডিও পৃথিবীর অন্যতম সেরা ও বড় ফিল্ম স্টুডিও। থ্যালবার্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং ও লুই মেয়ার পাঁচশোজন অফিসার এবং ফিল্মের বিশ্ববিখ্যাত অনেক পরিচালক প্রযোজক ও চিত্রনাট্য লেখক কাজ করেন। দু'নম্বর লটে আউটডোর সেট। সুইজারল্যাণ্ডের আলপস্ পর্বত, আমেরিকার পুরোনো দিনের শহর, ম্যানহাটনের বস্তি হাওয়াইয়ের সমুদ্র উপকূল সবই আছে। গাইড মেয়েটি বলছে, 'আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ। বিদ্যুৎ নিজেরা সরবরাহ করি। দৈনিক দুহাজার লোকের খাবার নিজেরা তৈরী করি এবং নিজেদের সেট নিজেরা বানাই। আমাদের আর কাউকে দরকার নেই।'

ক্যাথরিন হেসে বলে, 'শুধু ফিল্ম দর্শকদের দরকার আছে।'

সেট অর্থাৎ দুর্গ বোঝাতে দুর্গের সামনে দিকের মডেল, সান-ফ্রানসিসকো থিয়েটার বোঝাতে শুধুই লবি, থিয়েটার নেই। সাউণ্ড ষ্টেজের ভেতরে এয়ার কর্পসের পোষাকপরা অভিনেতারা। জেনারেলের পোষাক পরা অভিনেতাকে ধমকাচ্ছে করপোর্যাল অ্যালান বেনজামিন, 'আমার আর জেনারেল চাইনা, সাধারণ সৈনিক চাই। সবাই চীফ হতে চায়, কেউ ইনডিয়ান হতে চায় না।'

'এক্সকিউজ মী, আমি ক্যাথরিন আলোকজাণ্ডার।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই যে চালু চালিয়াত অভিনেতা ছোকরারা শোনো তোমাদের ঠাট্টা ইয়ার্কি ফাজলামি সব বন্ধ। ওয়াশিংটনের প্রতিনিধি এসে গেছেন। মিস, আমি এখানে কী যে করছি, আমি তো নিজেই জানিনা। ডিয়ারবোর্ণের আসবাবের ব্যবস্থা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন চালিয়ে বছরে সাড়ে তিনহাজার ডলার কামাতাম। সিগন্যাল কর্পসে আমায় করপোর্যাল করা হলো। তারপর ওরা আমায় ফিল্ম পরিচালনা করতে পাঠালো। ফিল্মের আমি কী বুঝি?'

লোকটা পালালো।

সোয়েটারপরা একটা লোক এগিয়ে আসে। মাথায় ধূসর চুল। 'ওয়েলকাম টু হলিউড। আমি অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর টম ও-ব্রায়েন। করপোর্যাল অ্যালানের ডাইরেক্ট করার কথা। মনে হচ্ছে, ও আর ফিরবেনা।'

'পরিচালনার কাজ আপনি করবেন?'

'আমি এই গোল্ডউইন-মেয়ার স্টুডিওতে আজ পঁচিশ বছর কাজ করছি। উইলিয়ম ওয়াইলারের দুটো ফিল্মে আমি সহকারী পরিচালক ছিলাম। অবস্থা খুব খারাপ নয়। চিত্রনাট্য তৈরী, সেট তৈরী, একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই হয়।'

কয়েকজন অভিনেতার ইউনিফর্ম একদম ফিট করেনি। ওকে ওয়েষ্টার্ণ কষ্টিক্রম থেকে ইউনিফর্ম বদলে আসতে বলে ক্যাথরিন। একজন বলে, 'আজ রাতে কার সঙ্গে ডিনার খাবে মিস?'

ক্যাথি বলে, 'আমার স্বামী বকসিং ম্যাচ থেকে ফিরলে তার সঙ্গেই খাবো।'

সৈনিকের পোষাকপরা এক সুপুরুষ 'এক্সট্রা' তিনটে মেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করছে।

ক্যাথি বললো, 'এক্সকিউজ মী। এদিকে এসো। স্যুটিং শুরু হবে।' ছোকরা মেয়েদের কানে কানে কী যেন বলে। মেয়েরা হাসে। লোকটা অপদার্থ, ক্যাথি ভাবে। চেহারা সুন্দর বলে ওর শহরের সবাই বলেছিলো হলিউডে গেলে নায়ক হতে পারবে। অথচ হলিউডে এসে জেনেছে, শুধু সুদর্শন হলেই তারকা হওয়া যায় না, অভিনয় প্রতিভা থাকা চাই। প্রতিভার অভাবে ও এক্সট্রা হয়েছে।

লোকটার উইনিফর্ম চমৎকার ফিট করেছে। কাঁধে ক্যাপ্টেনের পদ-মর্যাদা-সূচক বার। বুকে রঙীন রিবন ও মেডেল। ক্যাথি বলে, 'তোমায় কে বলেছে, তোমায় ক্যাপটেনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে?'

'কেন আমায় মানায়না?'

'না।'

'সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট?'

'কোনো অফিসারের ভূমিকাতেই তোমায় মানায় না। মেডেল কেন লাগিয়েছো? আমেরিকা এখনও যুদ্ধে নামেনি। যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়ে সৈনিক মেডেল পায়। তোমার ক্ষেত্রে লোক ভাববে, পদকগুলো কারনিভ্যালে কেনা। মেডেল খুলে ফেলো।'

'ঠিক আছে, বস।'

'আমায় বস বলে ডেকোনা।'

লানচের আগে প্রথম দৃশ্যের শুটিং শেষ করলো টম ওব্রায়েন। সব ভালোই হলো। শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। উদ্ধত ওই এক্সট্রাকে অপমান করার উদ্দেশে কয়েকটা লাইন তাকে পড়তে বলেছিলো ক্যাথি। ছোকরা চমৎকার সংলাপ বললো, চমৎকার অভিনয় করে শেষে বললো, 'কী হয়েছে তো বস?'

লানচের সময় ক্যাথি দেখলো, মেয়ে তিনটের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করলো এক্সট্রা ছোকরা, তারপর ক্যাথির দিকে এগিয়ে এলো, 'আমায় দেখে সত্যিকারের সৈনিক বলে মনে হয়না?'

'ওই মেয়েদের মনে হতে পারে। আমি জানি, তুমি ভুয়ো।'

'আমাকে তুমি পছন্দ করোনা বস?'

'না, ইউনিফর্ম পরে মেয়েদের সঙ্গে হাসাহাসি করা আমি পছন্দ করি না। তুমি আর্মিতে নাম লিখিয়েছ?'

'গুলি খেয়ে মরার জন্যে? বোকার কাজ।'

'তোমার বয়সে তুমি আর্মিতে যোগ দিতে বাধ্য।'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ওয়াসিংটনের হোমরা চোমরাদের আলাপ আছে। আমায় ওরা ধরতে পারবে না।'

'আমি তোমায় ঘেন্না করি।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

'আজ রাতে তোমার ওখানে ডিনার খাব। তখন জানবে।'

'তোমায় আর সেটে যেতে হবে না। সকালের কাজ যা করেছ, তার জন্য চেক পাঠিয়ে দেবেন মিষ্টার ওব্রায়েন। তোমার নাম?'

'ডগলাস, ল্যারী ডগলাস।'

পরের রাতে লণ্ডন থেকে ফ্রেজারের ফোন আসে। ল্যারী ডগলাস সংক্রান্ত ঘটনার কথা ফোনে বললনা ক্যাথি। বিল ফিরুক, তারপর এই নিয়ে দুজনে হাসাহাসি করবে। পরের দিন সকালে মস্ত গোলাপের তোরা তার হাতে দেয় ডেলিভারী বয়। 'সুন্দর ফুল', ক্যাথি বলে। বয় বলে 'দাম দিন। পনের ডলার।'

'তার মানে?' ফুলের সঙ্গে কার্ডে লেখা, 'চাকরী নেই বলে ফুলের দাম দিতে পারলামনা—ল্যারী ডগলাস।'

'ফুল আমার চাইনা', ক্যাথী বলে।

'ও বলছিল, এটা ঠাট্টা, আপনি হাসবেন।'

'আমি হাসছি না,' ক্যাথি বললো ঝাঝালো কণ্ঠে।

ঘটনার কথা ভেবে সারাদিন রেগে আগুন হয়ে আছে ক্যাথি। দেখতে সুন্দর বলে ল্যারী ডগলাসের এতো ঔদ্ধত্য, এতো অহঙ্কার। আসলে ভেতরে ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য। বোকা ব্লণ্ড, ব্রুনেট যুবতীদের অনায়াসে বিছানাতে তুলে ও ক্যাথিকে সস্তা ভাবছে।

সন্ধ্যে ৭টায় স্টেজে এলো সেণ্ট্রাল কাষ্টিং এর চার্জস্লিপ, 'এই ড্রেস ভাড়ার চার্জ মেটান। ক্যাপটেনের ইউনিফর্ম বিভিন্ন রঙের দুটো স্যাভিস রিবন, দুটো মেডেল। অভিনেতার নাম-লরেন্স ডগলাস। চার্জ মেটাবেন ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডার। এম, জি, এম।'

মুখ লাল করে ক্যাথরিন বললো, 'ল্যারী ডগলাস মরার পর বীরত্বের জন্যে আমি এইসব মেডেল দিতে চাইলে আমি খরচা মেটাতাম।'

টম ওব্রায়েন সত্যি কাজের লোক। তিন দিনে শুটিং শেষ। এই ফিল্ম কোন পুরুস্কার পাবে না, কিন্তু ফিলে্মর গ্ল্যামার আমেরিকান যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অনুপ্রেরণা দেবে। শনিবার রাতে প্লেনে হলিউড ছেড়ে যেতে ভালোই লাগে ক্যাথির।

সোমবার সকালে অফিসে ল্যারী ডগলাসের ফোন।

'গুড মর্নিং। আপনার ঠিকানা খুঁজতে ঝামেলা হলো। আপনি গোলাপ ফুল পছন্দ করেন না?'

'মিষ্টার ডগলাস, আমি গোলাপ ফুল পছন্দ করি। আপনাকে পছন্দ করি না।'

'কিন্তু আপনি তো আমার ব্যাপারে কিছুই জানেন না'

'আর আমি জানতে চাইনা। আপনি একটা কাপুরুষ। আর কখনও ফোন করবেন তা।' ঠকাশ করে রিশিভার রেখে দেয় ক্যাথি।

তিন দিন পরেই পোষ্টে এলো লরেন্স ডগলাসের মস্ত বড়ো ফটো নিচে লেখা, 'বসকে ভালবাসা জানিয়ে—ল্যারী।'

অ্যানি বললো, 'কি দারুণ দেখতে! ফটোটা ছিঁড়লে কেন?'

'ভুয়ো। হলিউডের সেটের মতো। সামনেটাই আছে, ভেতরে ফাঁপা। কিছু নেই।'

দুহপ্তায় অন্ততঃ এক ডজন ফোন এলো ল্যারীর। ক্যাথি জবাব দিলোনা। অ্যানি বললো, 'তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি কিছু বলিনি।'

রবিবার সকালে ওয়াশিংটনের এয়ারপোর্টে বিলের জন্য অপেক্ষা করছিলো ক্যাথরিন। বিল বলে, 'হলিউড তোমার ভালো লাগলোতো? আজ রাত আটটায় জেফারসন ক্লাবে ডিনার খাবো আমরা।'

'মিসেস উইলিয়ম ফেজার,' আপনমনে বলে ক্যাথি। বেশ গাম্ভীর্য আছে নামটার। কিন্তু এখন আর তেমন চমক লাগেনা।

জেফারসন ক্লাবের সদস্য হওয়া খুবই শক্ত। উইলিয়ম ফেজারের বাবা এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলো। ফেজার ও ক্যাথি সপ্তাহে একবার এখানে

ডিনার খায়। এখানকার শেফ রৎসচাইল্ডের ফরাসী শাখার শেফ হিসেবে কুড়ি বছর চাকরী করেছে। রান্না দারুণ পুরোনো, ভাল দামী মদের ব্যাপারে সারা আমেরিকায় ওর স্থান তিন নম্বরে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক ডেকরেটর আলো ও রঙের ব্যাপারটা দেখায় ডিনারের সময় মনে হলো মেয়েরা যেন মোমের নরম আলোয় বসে ডিনার খাচ্ছে। ভাইসপ্রেসিডেণ্ট, ক্যাবিনেট বা সুপ্রীমকোর্ট সদস্যদের সঙ্গে এখানে ডিনারে দেখা হতে পারে। কিম্বা নামজাদা শিল্পপতিদের সঙ্গে। স্কচ ও সোডার অর্ডার দেয় ফেজার। ক্যাথি মদ খায় না। 'বদভ্যাস করা ভালো', বিল বলে। হঠাৎ অবাক হয়ে ক্যাথি দেখে, ল্যারী ডগলাস এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ল্যারী বিলের উদ্দেশ্যে বললো, 'হ্যালো বিল।'

'তোমায় দেখে খুশি হলাম, ল্যারী।' কথা বলে উঠলো ফেজার। ক্যাথির উদ্দেশ্যে বললো। 'ক্যাথি, ইনি ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের স্কোয়াড্রনের লীডার লরেন্স ডগলাস। এখন আমাদের পাইলটের ট্রেনিং দেবেন।'

কী আশ্চর্য! ভুয়ো সৈনিক ভেবে, মেডেল রিবন সব নকল ভেবে, সিনেমার এক্সট্রা ভেবে, কাপুরুষ ভেবে একেই কতো কী বলেছে ক্যাথি।

'বিল শুনলাম হলিউডে তুমি একটি ফিল্মের ব্যাপারে যাবে। তাই আমি হলিউডে এম, জি, এম, স্টুডিওয় গিয়েছিলাম।'

'ক্যাথির সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'অতো ভিড়ে···

'বিয়ে হয়নি এখনও?'

'আমায় কে বিয়ে করবে

ইউ বাস্টার্ড, ক্যাথরিন ভাবে। তোমার একশো মাইলের মধ্যে কোনো মেয়ের কৌমার্য অক্ষয় থাকবেনা।

'স্কচ অ্যাণ্ড সোডা,' বিল অর্ডার দেয়।

'আমারও,' ক্যাথি বলে ওঠে।

'তুমি তো মদ খাওনা।'

'বদভ্যাস করা ভালো বলছিলেনা।' আসলে ক্যাথির এখন মদ খাওয়া খুব দরকার।

'ইংরেজ মেয়েরা কেমন?' ক্যাথি ঠাট্টা করছে।

'ভালো। তবে আমরা এতো ব্যস্ত ছিলাম···আকাশে উড়েই তো সময় কেটেছে···'

'বেচারা ইংরেজ মেয়েরা কী হারালো ওরা জানেনা।'

'ক্যাথি!' ফ্রেজার ওকে বাধা দেয়।

'আরো একটা,' প্রসঙ্গ বদলাতে চায় ল্যারী।

'আমরাও একটা,' ক্যাথি বলে।

'তুমি তো মদ খাওনা। এতো বেশী মদ খাওয়া···কিছু মনে করো না ল্যারী, ক্যাথি মাতাল হয়ে গেছে। ওকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দেই বোধ হয়··· ক্যাথির ইচ্ছে করছিলো গ্লাসটা ছুঁড়ে মারে ল্যারীকে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে হ্যাংওভারের দরুণ প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। এসব ল্যারী ডগলাসের জন্যেই। নইলে কখনো মদ খেতোনা ক্যাথি, বাথরুমে ঠাণ্ডা জলের শাওয়ার বরফের মত শরীরে বেঁধে। স্নান করে ভালোই লাগে। অফিসে যেতেই খবরের কাগজটা সামনে বাড়িয়ে দেয় অ্যানি।

খবরের কাগজের সামনের পাতায় ল্যারী ডগলাসের ইউনিফর্মপরা ছবি। নিচে ক্যাপশন, ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের আমেরিকায় ফিরছেন, আমেরিকান ফাইটার ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিতে।

অ্যানি জানায়, 'ল্যারী ডগলাস ফোন করেছিলো।'

'ফোন নম্বর দিয়েছে?'

'না।'

'এবার ফোন করলে আমায় ডেকে দিও।'

কিন্তু ফোন এলোনা। কেন ফোন করবে ল্যারী ডগলাস?

ক্যাথি অ্যানিকে বলে দিলো 'কাল মিষ্টার ডগলাস ফোন করলে বলে দিও, আমি অফিসে নেই।'

এলিভেটরের দিকে যেতে যেতে ক্যাথি ভাবছে, বিলকে বলতে হবে তাড়াতড়ি বিয়ে, তারপর হনিমুন। ততোদিনে শহর ছেড়ে যাবে এই ল্যারী ডগলাস।

অথচ লবিতে লিফট আসতেই দেখলো, লিফটের খোলা দরজার মুখোমুখি ইউনিফর্মপরা ল্যারী ডগলাস।

'ল্যারী, আমাকে এইভাবে জ্বালিওনা। আমাকে একা থাকতে দাও। আমি বিল ফ্রেজারের···

'বিয়ের আংটি কই?'

'কী চাও তুমি?'

'তোমাকে···সব কিছু।'

'আমার দারুণ হ্যাংওভার···মাথা ধরেছে···'

'হ্যাংওভারের ভালো ওষুধ আমার জানা আছে। আমার গাড়ীতে ওঠো, আমার ওখানে চলো। আমারও নার্ভাস লাগছে।'

উইলিয়ম ফ্রেজারের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ক্যাথির। বিলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে ল্যারীর সঙ্গে শুতে যাচ্ছে? বিল এতো ভালো। তাকে এভাবে আঘাত দেওয়া, বিশ্বাসঘাতকতা করা —কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তি যে হারিয়ে ফেলছে ক্যাথি।

দুজনেই নিঃশব্দে পোষাক খোলে।

তারপর উদম উলঙ্গ ক্যাথি ল্যারীর পুরুষাঙ্গের দিকে হাত বাড়ায়। ল্যারীর ঠোঁট ক্যাথির ঠোঁটে, ল্যারীর হাত ক্যাথির স্তনবৃন্তে, ল্যারীর তপ্ত কঠিন স্পন্দমান পুরুষাঙ্গ ক্যাথির পিচ্ছিল, তপ্ত যোনির গভীরে। ঘর কেঁপে ওঠে এবং সেই সঙ্গে গোটা পৃথিবী। যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

ভোর পাঁচটায় বিল ফ্রেজারের বাড়িতে ফোন বাজে।

'হ্যালো বিল, আমি ক্যাথরিন।'

'ক্যাথি, সারা সন্ধ্যে আমি তোমায় খুঁজেছি। তুমি কোথায়? ভালো আছ তো?'

'ভালো আছি। আমি মেরীল্যাণ্ডে। ল্যারী ডগলাসের সঙ্গে। একটু আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

নয়

প্যারী, ১৯৪১ প্রাইভেট ডিটেকটিভ ক্রিশ্চিয়ান বারবেইৎ জানে, শেষ এই রিপোর্ট পাবার পর ফিল্মস্টার হেলেন পেইস আর কোনদিন তার কাছে আসবেনা, তাকে টাকাও দেবেনা। রিপোর্ট দেয়া শুরু করলো ও, 'প্রথমতঃ তোমার বন্ধু ল্যারী ডগলাস প্রোমোশন পেয়ে ক্যাপটেন হয়েছিলো। তারপর সে ১৩৩ নম্বর স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার হিসেবে

কেমব্রিজশায়ারের ডাবস্টফোর্ড থেকে হ্যারিকেন, স্পিটফায়ার টু এবং মার্ক ফাইভ বিমান উড়িয়েছে...'

'ওসব শুনতে চাইনা।' বাধা দিয়ে বলে হেলেন, 'ও এখন কোথায়?'

'ওয়াশিংটনে। আর, এ, এফ থেকে ইউ, এস আর্মি এয়ার কর্পসে। ওখানেও ক্যাপটেন। এবার এই খবরের কাগজটা দেখো।'

ন্যুইয়র্ক ডেলি নিউজ। বিখ্যাত এয়ারফোর্সের পাইলটের বিবাহ। নিচে ল্যারী ডগলাস ও তার বউ ক্যাথরিন আলেকজাণ্ডারের ছবি।

ফটোটা অনেকক্ষণ ধরে দেখলো হেলেন, তারপর বললো 'ওয়াশিংটনের প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করো। প্রত্যেক সপ্তাহে রিপোর্ট চাই।'

...সারাটা বিকেল বন্ধ ঘরে ল্যারী ও তার নতুন বউ ক্যাথির মুখ দুটো ফটোয় দেখেছে হেলেন।

ল্যারীর বউ সুন্দরী, যুবতী, ওর মুখে বুদ্ধির ছাপ।

শত্রুর মুখ। ল্যারীর মতো ক্যাথিকেও ধ্বংস করবে হেলেন।

সে রাতে নাটকের পর আরমাঁদকে অনেক আনন্দ দিলো হেলেন। ...কিন্তু হেলেনের মন ছুঁতে পারছেনা আরমাঁদ। সেই মনের অতলে কী যে গভীর রহস্য...

সে রাতে হেলেন দুঃস্বপ্ন দেখে।

সারা শরীরে একটা লোম নেই, অস্বাভাবিক সাদা রঙ—জারমান কর্নেল মুয়েলার লাল তপ্ত লোহা দিয়ে হেলেনের শরীরে স্বস্তিকার ছাপ দিচ্ছে। বলো, ফরাসী ইহুদী মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ্ ওরফে আরশোলা কোথায়? হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে ও দেখে টেবিলে ল্যারী ডগলাস। তার শরীরে তপ্ত লোহার ছাপ দিচ্ছে হেলেন। ল্যারী আর্তনাদ

করছে। ঘুম ভেঙে যায়। আলো জ্বালিয়ে কাঁপা আঙুলে সিগারেট ধরিয়ে সে ভাবে, ডক্টর ইজরায়েল কাৎজের কী হবে? ওর একটা পা হাঁটুর নিচে থেকে কাটতে সাহায্য করছে হেলেন! দারোয়ান খবর দিয়েছে ইজরায়েল বেঁচে আছে। কিভাবে ওকে লুকিয়ে রাখা যাবে? ওকে ফ্রান্সের বাইরে পাঠাতেই হবে কিন্তু প্যারীর প্রত্যেকটা রাস্তায় নজর রাখছে জারমান বাহিনী। নদীতেও জার্মানরা পাহারা দিচ্ছে। অথচ ইজরায়েল···এই ইজরায়েল তাকে সাহায্য করেছে। তার প্রাণ বাঁচিয়েছে...উপকারের বিনিময়ে অন্য পুরুষ চায় হেলেনের শরীর। কিন্তু এই বীর মুক্তিযোদ্ধা শুধু দিতে জানে প্রতিদানে কিছু চায় না। ইজরায়েলকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু, কর্নেল মুয়েলারের গেস্টাপোবাহিনী সন্দেহ করছে হেলেনকে। হাতেনাতে ধরতে পারলে ওরা চালাবে অত্যাচার করবে। ওদের হাতে যেন কোনো প্রমাণ না থাকে...

প্যারী থেকে বেরোবার সব রাস্তা বন্ধ। নাৎসীরা বর্বর. নাৎসীরা ফ্যাসিবাদী, নাৎসীরা অমানুষ। কিন্তু নাৎসীরা বুদ্ধিমান।

কারো সাহায্য নেওয়া যাবেনা। আরমাঁদ বুদ্ধিজীবী, ফ্যাসিস্ত নাৎসীদের ঘেন্না করে। কিন্তু আরমাঁদ গেস্টাপোর ভয়ে কাঁপছে। কর্নেল মুয়েলারের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধলে জারমান জেনারেল শেইডার সত্যিই কী সাহায্য করবে?

পরের দিন সন্ধ্যায় লেসলী রোকাসের পার্টিতে ব্যাংকার, আরটিষ্ট, রাজনৈতিক নেতা ও জারমানদের জন্য সুন্দরী ফরাসী সঙ্গিনীরা আসে। নৈশভোজের ঠিক পনেরো মিনিট আগে হুড়মুড় করে ঢুকলো একটা

বুড়ো। হেলেন বললো, 'আরমাঁদ, আমায় অ্যালবেয়ার হেলারের পাশে বসিও।'

ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যলেখক অ্যালবেয়ার হেলার। মাথায় এলোমেলো সাদা চুল, চওড়া কাঁধ। বয়স ষাট পেরিয়েছে। ভীষণ লম্বা, কুৎসিৎ মুখ সবুজ চোখের দৃষ্টি এতো তীক্ষ্ণ যে, কোনো কিছুই তার নজর এড়ায়না। অপূর্ব কল্পনাশক্তি এই চিত্রনাট্যলেখক ও নাট্যকারের। এক ডজন হিট নাটক, একডজন হিট ফিল্মের চিত্রনাট্যকার। ওর নতুন নাটকে অভিনেত্রী হতে পারলে হেলেন খুশি হতো।

'অ্যালবেয়ার, তোমার নতুন নাটক পড়ে খুব ভালো লাগলো।'

বুড়ো অ্যালবেয়ারের মুখে খুশির ভাব ফুটে ওঠে, 'তাহলে তুমি নায়িকা হবে?'

'হতে পারলে খুশি হতাম, ডারলিং। আরমাঁদের নতুন নাটকে পার্ট করতে হবে।'

বুড়ো ভুরু কুঁচকে বলে, 'একদিন না একদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করবো।'

'অ্যালবেয়ার, কিভাবে তোমরা নাটকের প্লট খুঁজে পাও?'

'তোমরা যেভাবে অভিনয় করো। এই আমাদের ব্যবসা, এই আমাদের জীবিকা।'

'না, তোমরা কল্পনাশক্তি ব্যবহার করো। যা আমার নেই আমি একটা নাটক লেখার চেষ্টা করছি। এক জায়গায় আটকে গেছে…'

এবার ঝুঁকে পরে চাপা গলায় বলে হেলেন,

'অ্যালবেয়ার, পরিস্থিতিটা এরকম···আমার নায়ক ফরাসী মুক্তি-যোদ্ধা। আমার নায়িকা তাকে প্যারীর বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করছে। নাৎসীরা তাকে খুঁজছে···

নাটক নয়, জীবন, নাট্যকার আলবেয়ার বুঝে যায়। প্লেটে কাঁটা নাড়তে নাড়তে বলে, 'সহজ। জারমান ইউনিফর্ম পরে ওদের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাবে।'

'হলোনা। ওর পা কাটা। ও হাঁটতে পারে না।'

প্লেটে কাঁটার শব্দ আসে। অ্যালবেয়ার বলে, 'সেইন নদীর বুকে মালবাহী নৌকো?'

'নাৎসীরা নজর রেখেছে।'

'প্যারী থেকে বের হবার সব রাস্তায় প্রহরা?'

'হ্যাঁ।'

'নায়িকা সুন্দরী?'

'হ্যাঁ।'

'ধরো কোনো জারমান জেনারেলের সঙ্গে নায়িকার ভাব···'

এখন আর হেলেনের দিকে তাকাচ্ছেনা অ্যালবেয়ার, 'সম্ভব?'

'হ্যাঁ।'

'নায়িকা নাৎসী জেনারেলের সঙ্গে উইক এণ্ডে প্যারীর বাইরে যাবে। জেনারেলের গাড়ীর পেছনে ট্রাংকে লুকিয়ে মুক্তিযোদ্ধাকে রাখবে তার সহযোদ্ধারা। জেনারেলের গাড়ী সার্চ হবেনা।'

'ট্রাংক বন্ধ থাকলে লোকটা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরবে।'

'না।' হেলেনের কানে কানে পাঁচ মিনিট কথা বলে অ্যালবেয়ার, বলে 'গুড লাক,' কিন্তু সে একবারও হেলেনের মুখের দিকে তাকায়না।

পরের দিন সকালে জেনারেল হ্যানস শেইডারকে ফোন করলো হেলেন।

'হ্যানস, তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখলাম। চলো, এই উইক-এণ্ডে আমরা গাড়ীতে লা হ্যাভর-এর কাছে এবং প্যারী থেকে দেড়শ মাইল দূরে এত্রাতাৎ নামের সুন্দর গাঁয়ে যাই।'

'কিন্তু এখন আমার এতো কাজ…'

'ঠিক আছে। পরে দেখা যাবে?'

'দাঁড়াও। কবে যাবে?'

'শনিবার রাতে থিয়েটারের পরে।'

'বেশ, আমি থিয়েটারে গাড়ী নিয়ে যাব।'

'না, আমার ফ্ল্যাটে।'

পনেরো মিনিট পরে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে হেলেন।

দারোয়ান বললো। 'আমি আরশোলাকে বলবো। কিন্তু মাদামোয়াজেল, ও কিছুতেই রাজি হবেনা। এর চেয়ে ওর পক্ষে গেস্টপো হেডকোয়ার্টারে চাকরী খোঁজা বেশী নিরাপদ।'

'এই প্ল্যান কখনোই বিফলে যেতে পারেনা। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর প্ল্যান কখনো নিষ্ফল হবেনা…।'

ফ্ল্যাটের বাইরেই খবরের কাগজে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিলো জার-মান গেস্টাপো। হেলেন বের হতেই সে ফলো করে। দোকানের শো-কেসগুলো দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাঁটে ও। পাঁচ মিনিট পরে দারোয়ান ট্যাকসিতে সাঁৎসাৎ এর এক খেলার সরঞ্জামের দোকানে যায়। দুঘণ্টা পরে হেলেন—

খবর পায়, 'শনিবার রাতে মাল পৌঁছে যাবে।'

শনিবার রাতে অভিনয় সেরে হেলেন ড্রেসিংরুমে ঢুকেই দেখে, গেস্টাপো কর্নেল মুয়েলার আর্মচেয়ারে বসে আছে।

'আমি পোষাক বদলাবো।'

'আমার সামনেই বদলাও।'

বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা হোমোসেকসুয়্যাল মেয়েমানুষের দেহে ওর কোনো আগ্রহ নেই।

'একটা চড়ুইপাখী আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললো, সে নাকি আজ রাতে প্যারী ছেড়ে পালাবে।'

'কে পালাবে?'

'তোমার বন্ধু ইজরায়েল কাৎজ্।'

'সে কে···দাঁড়াও, তরুণ ইনটার্ন?'

'মনে আছে তাহলে?'

'হ্যাঁ, সে আমার নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করেছিলো···'

'এবং পরে অ্যাবরশনের।'

অর্থাৎ গেস্টাপো খোঁজ নিয়েছে। গেস্টাপো নিশ্চিত আরশোলা ওরফে বিপজ্জনক ফরাসী ইহুদী মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর ইজরায়েল কাৎজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিত্র জগতের তারকা হেলেন পেইস।

'তুমি তো বললে যে কয়েক সপ্তাহ আগে তুমি কাফেতে ডক্টর ইজরায়েল কাৎজের সঙ্গে দেখা করেছিলে?'

'কর্নেল, আমি এইরকম কিছু বলিনি।'

'তুমি সুন্দরী। তোমার সৌন্দর্যকে ধ্বংস করতে আমি দুঃখ পাবো। তাও এমন একজনের জন্যে, যে তোমার আপনজন কেউ নয়। বলো, তোমার বন্ধু ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ্ কী আজ রাতে প্যারী ছেড়ে পালাতে চায়?'

যেখানে ফ্যাসিবাদ, সেখানেই অত্যাচার। যেখানে অত্যাচার, সেখানেই বিপ্লবী প্রতিরোধ। ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ্ কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে একটা অসহায় মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছে। একবার নয়, দুবার। সে হেলেনের আপনজন নয়? তবে আপনজন কে? বাবা, যে ওকে বেচে দিয়েছে বড়লোকের কাছে? ল্যারী ডগলাস যে ভালোবাসা আর বিশ্বাসের মূল্য দেয় নি? ফিলিপ সরেইল, যাকে শরীর দিয়ে সাফল্যের সিঁড়িতে পা রেখেছে হেলেন আরমঁাদ, যাকে শরীর বিলিয়ে কামনার উন্মাদ করে দিয়ে আজ অভিনেত্রী হয়েছে? সবাই দানের বদলে প্রতিদান চায়। সবাই স্বার্থপর, কেউ বা প্রবঞ্চক। শুধু এই পৃথিবীর ইজরায়েল কাৎজরা দিতে জানে, প্রতিদানে তারা যদিবা কিছু চায়, নিজের জন্যে নয় দেশের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, বড় কিছুর জন্যে। নির্বোধ নাৎসী বর্বর কী করে বুঝবে কেন ইজরায়েলকে বাঁচাতে উৎসুক হেলেন।

এখন নাটকের অসহায় নায়িকা অ্যানেৎ-এর ভূমিকায় অভিনয় করছে হেলেন। 'আপনি কী বলছেন, কর্নেল,? আপনাকে কেমন করে সাহায্য করা যায়, আমি জানিনা।'

'কেমন করে সাহায্য করতে হয়, আমি তোমায় শেখাব। আমার ভালোই লাগবে···ভালো কথা, আমাদের জেনারেল হ্যান্স শেইডারকে আমি এই উইক এণ্ডে তোমার সঙ্গে না যেতে উপদেশ দিয়েছি।'

'জার্মান জেনারেলরা ব্যক্তিগত জীবনে জার্মান গেস্টাপোর পরামর্শ মাফিক চলেন?'

'এক্ষেত্রে চলেননি। জেনারেল শেইডার তোমার সঙ্গে যেতে বদ্ধপরিকর।

কর্নেল চলে গেলেন। ভয়ে উত্তেজনায় বুক ধুকধুক করছিলো হেলেনের।

পৌনে বারোটায় দারোয়ানের ফোন এলো, 'জেনারেল এসেছেন।'

'ড্রাইভার?'

'গাড়ীতে।'

করিডরে জেনারেল। পেছনে ড্রাইভার, তরুণ ক্যাপ্টেন। ধূসর রঙের নিখুঁত কাটিং-এর শার্ট, হাল্কা নীল রঙের শার্ট, কালো টাই জেনারেলকে দারুণ দেখাচ্ছে।

'গুড ইভনিং।'

'আমার লাগেজ বেডরুমে।'

ক্যাপটেন বেডরুমের দিকে গেলো। জেনারেল বললো, 'আমার ভয় ছিলো, তুমি মত বদলাতে পারো।'

'আমি কথা দিলে কথা রাখি।'

ক্যাপটেন কাগজ নিয়ে চলে যায়।

'যাওয়ার আগে ড্রিংকস।' গ্লাসে অর্থাৎ শ্যামপেন ঢালে হেলেন, 'এত্রাতাৎ।'

'এত্রাতাৎ!'

গ্লাসে গ্লাস ঠেকায় দুজনে। জেনারেল বলে—'তোমায় রহস্যময় মনে হয়। প্রথমে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতেই রাজি হওনি। আজ তুমি আমার সঙ্গে উইক এণ্ডে চলেছো। যেহেতু পরিবেশটা রোমান্টিক। আমি এইসব রহস্যের সমাধান খুঁচছি।'

'সমাধান জানলে সমস্যা আর ভালো লাগবেনা।'

'দেখা যাবে। এবার যাওয়া যাক।'

খালি শ্যামপেন গ্লাস রাখতে রান্না ঘরে ঢোকে হেলেন।

দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান খুঁচছে জেনারেল। সুন্দরী, রূপসী। ওকে চায় জেনারেল। কিন্তু সে বুদ্ধিমান। সে নির্বোধ ও অন্ধ নয়। গেস্টাপোর

কর্ণেল জানিয়েছে থার্ড রাইখের বিপজ্জনকশত্রু ডক্টর ইজরায়েল কাৎজের সঙ্গে যোগাযোগ আছে হেলেনের। এই গেস্টাপো কর্ণেল মুয়েলার চট করে ভুল করে না। হেলেনের কি এই ধারণা জন্মেছে যে, তার সুন্দর শরীরের লোভে দেশের শত্রুকে বাঁচাতে ওকে সাহায্য করবে জার্মান জেনারেল? অসম্ভব। বিনা দ্বিধায় ওকে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেবে জার্মান জেনারেল। কিন্তু, তার আগে ও এই ফরাসী রূপসীর সঙ্গে রাত কাটাবে। জার্মান মানসিকতার এটাই ধারা।

টেলিফোন তুলে দারোয়ানকে ফোন করে হেলেন, 'আর একটা সুটকেস আছে। ক্যাপটেনকে ডাকো।'

'আরমাঁদ কী জানে যে তুমি আর সঙ্গে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ' মিথ্যে বলে হেলেন।

'কখন প্যারীতে ফিরবে?'

'সোমবার বিকেলে। তার মানে দুদিন সময়।' বেডরুম থেকে বের হয়ে ক্যাপটেন বলে, 'এক্সকিউজ মী, সুটকেশটা দেখতে কেমন?'

'বড়, গোল নীল একটা সুটকেশ। ভেতরে নতুন গাউন ছিলো। পরে দেখাতাম তোমায়', জেনারেলকে বলে হেলেন।

বেডরুমে খুঁজে এসে ফ্রাইভার বলে, 'স্যার পাচ্ছিনা।'

'আমি আমি দেখছি। ঝিটা উজবুক, কোথায় রেখেছে…'

সবকটা ক্লোজেট খোঁজা হলো। শেষে হলঘরের ক্লোজেটে সুটকেস পেলো জেনারেল।

'কিন্তু এটা তো খালি।'

'উজবুক ঝিটা গাউন অন্য সুটকেশে রেখেছে তাহলে। বাদ দাও। চলো, যাই। আমি তৈরী।'

এর মধ্যে ইজরাইলের সঙ্গীসাথীরা ওকে গাড়ীর পেছনের ট্রাংকে ঢুকিয়েছে তো ?

দারোয়ানের মুখ ফ্যাকাসে।

ক্যাপটেন গাড়ীর দরজা খুললো। দারোয়ানকে কোন ইঙ্গিত করার সময়ই পেলোনা হেলেন। জেনারেল যেন ইচ্ছে করেই ওকে আড়াল করলো।

কিন্তু দারোয়ানের মুখ ফ্যাকাসে কেন ?

প্ল্যানমাফিক কাজ হয়নি ? লবিতে যদি ওর সঙ্গে দেখা করা যায়।

'হ্যানস, এক বন্ধু ফোন করার কথা আছে, দারোয়ানকে বলে যাব…'

'না, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এখন থেকে তুমি শুধু আমার কথা ভাববে।'

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

জেনারেল শেইডারের লিম্যুসিন চলে যাবার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে ওই অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে থামলো গেস্টাপোর কালোরঙের মর্সিডিজ গাড়ী। কর্ণেল মুয়েলার জানতে চাইলেন—'হেলেন পেইস কোথায় ?'

দারোয়ান ভয়ে ভয়ে বললো, 'জার্মান আর্মি অফিসারের গাড়ীতে কোথায় গেলেন।'

'তা আমি জানি, বোকা গবেট। কোথায় কোনদিকে গেলেন ?'

'আমাকে তো কিছু বলেনি

দারোয়ানের দিকে কটমট করে তাকালো কর্ণেল মুয়েলার তারপর গেস্টাপোর সহকর্মীদের অর্ডার দিলো, যে কোনো রাস্তায় জেনারেল শেইডারের গাড়ী গেলে গাড়ী থামিয়ে ওকে ফোনে ডাকাও। মিলিটারী ট্রাফিক কম থাকায় জেনারেলের গাড়ী দ্রুত প্যারী ছেড়ে ভার্সেইর দিকে ছুটে চললো।

রোডব্লক। লাল আলো। জারমান আর্মি লরি রাস্তা আটকে আছে। দুপাশে আধডজন জারমান সৈনিক, ফরাসী পুলিশের দুটো গাড়ী। জারমান আর্মি লেফটেন্যান্ট বললো, 'বাইরে এসে আইডেন্টি-ফিকেশন দেখব।'

জেনারেল পেছনের জানালা থেকে মুখ বের করে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি জেনারেল শেউডার। এখানে হচ্ছে কী?'

সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট করে সচকিত হয়ে লেফটেন্যান্ট বললো, 'স্যার, প্রত্যেকটা গাড়ী সার্চ করার অর্ডার আছে। ক্যাপটেন ড্রাইভার, প্লীজ, পেছনের লাগেজ কমপার্টমেণ্ট খুলে দেখাও।'

'ওতে লাগেজ ছাড়া কিছু নেই। আমি নিজে লাগেজ রেখেছি।'

'সারি ক্যাপটেন, আমাকে সাফ সাফ অর্ডার দেওয়া হয়েছে। প্যারী থেকে যে কোনো গাড়ী এলে সার্চ করতে হবে।'

ড্রাইভার বেরোতে যাচ্ছে।

জেনারেলের মুখ লাল, ঠোঁট টান টান।

হেলেন বললো, 'আমরাও বেরোবো, হ্যান্স? ওরা তো আমাদেরও সার্চ করবে?'

'দাঁড়াও।' জেনারেলের গলা চাবুকের আওয়াজের মতো, 'গাড়ীতে ফিরে এসো, ড্রাইভার। লেফটেন্যান্ট রোডব্লক সরাও। তোমার অর্ডার জারমান জেনারেলদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। ড্রাইভ অন।'

বাধ্য হয়ে রোডব্লক সরালো লেফটেন্যান্ট।

হেলেন ভাবছিলো ইজরায়েল এই গাড়ীর লাগেজ কম্পার্টমেণ্টে আছে কিনা এবং বেঁচে আছে কিনা।

জেনারেল বলছে, 'কখনো গেস্টাপোকে মনে করিয়ে দিতে হয় যে সেনাবাহিনীই যুদ্ধ করে, গেস্টাপো নয়।'

'এবং সেনাবাহিনী চালায় সেনানায়কেরা।' বললো হেলেন পেইস।

'ঠিক তাই।'

দশ মিনিট পরেই গেস্টাপো হেড কোয়ার্টার থেকে রোডব্রকের লেফটেন্যান্টের কাছে ফোন এলো।

লেফটেন্যান্ট জানালো, 'জেনারেলের গাড়ী দশ মিনিট আগে চলে গেছে।'

'তুমি সার্চ করেছিলে?'

'না, স্যার, জেনারেল বাধা দিলেন।'

'কোন দিকে গেছে জেনারেল?'

'রুয়েন বা লা হ্যাভরের দিকে।'

'কাল সকালে আমার অফিসে ৯টার সময় দেখা করবে।'

'ইয়েস স্যার।' লেফটেন্যান্ট বুঝেছে, ওর ভবিষ্যত খতম হয়ে গেলো।

জেনারেল শেউডার স্ত্রী, পুত্র আর্মি অফিসারের জটিল পারিবারিক জীবনের গল্প বলে। আর হেলেন বলে, অভিনেত্রীর জীবনের রোমান্টিক জটিলতার গল্প। দুজনেই জানে, এ শুধু কথা নিয়ে খেলা। আসলে, হেলেনের আসল ধান্দা কী, তাই জানতে চাইছে জেনারেল। এবং হেলেন ভাবছে, শেষ অবধি বুদ্ধির খেলায় হারবে এই ভদ্র, বুদ্ধিমান জারমান জেনারেল।

শুধু একবারই যুদ্ধের কথা বলে জেনারেল, 'ব্রিটিশরা অদ্ভুত জাত। শান্তির সময় যারা কোনো ক্রমে দেশ চালায়, সংকট ও যুদ্ধের সময় তাদেরই অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখা যায়। ব্রিটিশ নৌ সৈনিক সবচেয়ে সুখী কখন? যখন তার জাহাজ ডুবছে।'

এত্রাতাৎ গাঁয়ের পথে লা হ্যাভরের বন্দরের ধারে রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ী থামাতে বলে হেলেন বলে, 'আমার ক্ষিধে পেয়েছে।'

গাড়ীর দরজা খুললো ক্যাপটেন। জেনারেল ও হেলেন নামলো। মোটরের শব্দ। জাহাজ মাল তোলার লিফট সমেত একটা গাড়ী এসে থামলো। মস্ত ক্যাপে মুখ প্রায় ঢাকা, পরণে ওভারঅল। দুটো লোক ফর্কলিফট নাড়াচাড়া করছে, একজন হেলেনের দিকে তাকালো।

'ক্যাপটেন কফি খাবে না?'

'ও গাড়ীতে বসে থাকবে।'

...সর্বনাশ! ক্যাপটেন গাড়ীতে বসে থাকলে সব নিষ্ফল, ভাবলো হেলেন।

উচুনীচু পাথুরে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পা হেড়কে রাস্তায় আছড়ে পড়লো হেলেন। ক্যাপটেন ছুটে এলো। ক্যাপটেন ও জেনারেল বললো,—'ক্যাপটেন, ওকে কাফেতে পৌঁছে দিয়ে গাড়ীতে ফিরবে।'

দুজন ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে হেলেনকে। ও পেছনে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে, ওভারঅলপরা শ্রমিক দুজন জেনারেলের গাড়ীর বুট খুলছে।

লা হ্যাভরের পুলিশস্টেশনের ক্যাপটেন পুলিশ খবর দেয়, 'জেনারেলের গাড়ী বন্দরের কাছে।'

কর্নেল মুয়েলার খুশি হয়ে বলে, 'আমায় সেখানে নিয়ে চলো।'

পাঁচ মিনিট পরে গেস্টাপোর গাড়ী থামলো জেনারেলের গাড়ীর পাশে।

গাড়ী থেকে নামলো কর্নেল। প্রথমে ক্যাপটেন, তারপর জেনারেল এগিয়ে গেলো। জেনারেল বললো, 'কর্নেল, তুমি এখানে কী করছো?'

'আপনার গাড়ীর লাগেজ কমপার্টমেণ্ট সার্চ করবো, জেনারেল।'

'ওখানে মালপত্র ছাড়া কিছু নেই।'

'আমি খবর পেয়েছি যে জারমানীর এক শত্রু এই গাড়ীর লাগেজ কম্‌পার্টমেণ্ট লুকিয়ে আছে। তাকে পালাতে সাহায্য করেছে আপনার অতিথি হেলেন পেইস।'

জেনারেল ড্রাইভারকে বললো, 'ক্যাপ্টেন, লাগেজ কম্পার্টমেণ্ট খোলো।'

খোলা হলো। ভেতরে কিছু নেই। ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমাদের লাগেজ চুরি হয়েছে।'

রাগে লাল হয়ে ওঠে কর্নেল মুয়েলারের মুখ, 'ও পালিয়েছে?'

'কে পালিয়েছে?'

আরশ্যোলা ওরফে ইহুদী ডাক্তার ইজরায়েল কাৎজ্‌।

'অসম্ভব', জেনারেল বলে,

'বুট বন্ধ। ও মরে যেতো।'

কর্নেল মুয়েলার সঙ্গীকে তাড়া দেয়, 'ভেতরে ঢোকো।'

নির্দেশ মেনে লাগেজ কম্পার্টমেণ্টের ভেতরে ঢুকলো লোকটা।

মুয়েলার কম্পার্টমেণ্ট বন্ধ করলো। চার মিনিট পরে খোলা হলো। ভেতরের লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জেনারেল বললো, 'কেউ এর ভেতরে অতোক্ষণ থাকলে তার লাশটাই বার করা যাবে। কর্নেল, তোমার জন্যে আর কী করতে পারি?'

হেলেনকে গাড়ীতে তুলে জেনারেল ক্যাপ্টেনকে গাড়ী স্টার্ট দিতে বললো।

বন্দরের সর্বত্র সার্চ করলো গেস্টাপো। কিন্তু, পরের দিন বিকেলের আগে পরিত্যক্ত এক অব্যহৃত গুদামে শূন্য অক্সিজেন ট্যাংক ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

দুদিন উইকএণ্ডে কাটিয়ে সোমবার বিকেলে নাটকের অভিনয় শুরু হবার আগে প্যারীতে ফিরলো জেনারেল ও হেলেন।

দশ

ওয়াশিংটন, ১৯৪১-৪৪। ল্যারীর সংগে বিয়ে হওয়ার পর উইলিয়ম ফ্রেজারের অ্যাসিস্ট্যাণ্টের চাকরী ছেড়ে দিলো ক্যাথরিন। ওয়াশিংটনে ফেরার পর ক্যাথরিন যখন ফ্রেজারের সঙ্গে দেখা করলো। মনে হলো, বিলের বয়স হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে, মুখে দুঃখের ভাব। ক্যাথরিনের মন একটু খারাপ লাগলো। বিলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিলো, এখন ভাবলে যেন অবিশ্বাস্য লাগে।

'ক্যাথি, বিয়েটা হঠাৎ হয়ে গেলো, তাইনা? আমি প্রতিযোগিতার সময় পেলামনা।'

'হ্যাঁ, বিল, হঠাৎ হয়ে গেলো

'ক্যাথি, ল্যারীর সম্বন্ধে তুমি বিশেষ কিছু জানোনা, তাইনা?'

'আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি।'

'ক্যাথি, সাবধানে থেকো। ল্যারী ··অন্য ধরনের পুরুষ।'

'কিরকম ?'

'ওর সঙ্গে অন্যপুরুষের অনেক তফাৎ।...আরে আমার কথায় গুরুত্ব দিওনা। ঈশপের সেই 'আঙ্গুর ফল টক' গল্পটা মনে নেই ? তুমি চাকরী ছাড়লে কেন ?'

'ল্যারী তাই চায়।'

'মত বদলালে জানিও।

মধ্যরাতের অভিসার

ল্যারীর সঙ্গে জীবন অদ্ভুত মজার। প্রত্যেকটা দিনই অ্যাডভেনচার। প্রত্যেকটা দিনই ছুটির দিন। সপ্তাহান্তে গাঁয়ের ছোট্ট সরাইখানায় থাকা, গাঁয়ের মেলা দেখা, লেক প্ল্যাসিড-এর বুকে নৌকো ভাসানো, মাছধরা। সাঁতার শেখেনি বলে জলকে ক্যাথির বড় ভয়। ল্যারী পাশে থাকলে ভয় লাগেনা। হানিমুনে পুরোনো জিনিসের দোকানে রুপোর তৈরী ছোট পাখী তার পছন্দ হওয়ায় ওটা কিনে দিয়েছে ল্যারী।

রোববার ৭ই ডিসেম্বর। জাপান পার্লহারবার আক্রমণ করলো।

পরের দিন আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ক্যাপিটল প্লাজায় পোর্টেবল রেডিও সেট নিয়ে হাঁটছে অনেকে। ক্যাথরিন দেখে, প্রেসিডেন্টের ক্যারাভান ক্যাপিটলের গেটে থেমেছে, দুজন সহকারীর সঙ্গে নামছেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। রাস্তার কোণে কোণে শান্তিভঙ্গের আশংকায় পুলিশ মোতায়েন। জাপান আচমকা পার্লহারবার আক্রমণ করায় পাবলিকের মাথায় খুন চেপে গেছে।

কংগ্রেসে যুক্ত সভায় ভাষণদানরত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কঠিন, ক্রুদ্ধ ও তীব্র স্বর বেতারে ভেসে আসে...

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তৃতার সময় লাগলো ঠিক দশ মিনিট। আমেরিকান কংগ্রেসে যুদ্ধঘোষণার বক্তৃতার মধ্যে সংক্ষিপ্ততম।

জনতা চেঁচিয়ে উঠলো। এতোদিনে আমেরিকার ঘুম ভাঙছে। পুরুষদের মুখে অদ্ভুত উত্তেজনা। মেয়েরাও খুশি। ক্যাথি ভাবে, ওরা কী ভাবছে যে যুদ্ধ এক মজার খেলা? পুরুষেরা যখন মেয়েদের একা ফেলে যুদ্ধে যাবে, তখন ছেলে বা স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে কেমন লাগবে মেয়েদের।

রাতারাতি শহর ভরে গেলো ইউনিফর্মপরা মানুষে। বাতাসে এক উত্তেজনার ভাব। যেন শান্তি মানেই আলস্য এবং যুদ্ধই মানুষের বেঁচে থাকার সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করতে দেয়।

এয়ারবেসে এখন ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টা কাটাচ্ছে ক্যাপটেন ল্যারী ডগলাস। সে বলছে, পার্লহারবারের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। জাপানের আচম্বিত আক্রমণে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে আমেরিকার নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর বড় অংশ।

ক্যাথি বলে, 'তার মানে? বিশ্বযুদ্ধে আমরা হেরে যেতে পারি?'

ল্যারী বলে, 'প্রস্তুতি কতো তাড়াতাড়ি হবে, তার ওপর নির্ভর করে। আমেরিকানদের ধারণা, জাপানীরা বেঁটে খাটো মজার মানুষ। ভুল ধারণা। আসলে জাপানীরা শক্ত মানুষ, ওরা মরতে ভয় পায় না। আমরাই নরম মানুষ।'

পরবর্তী কয়েক মাসে মনে হলো, জাপানকে কিছুতেই ঠেকানো যাবেনা। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জাপানের আক্রমণের মুখে। ওরা গুয়াম, বোর্নিও এবং হংকং-এ নেমেছে। জেনারেল ম্যাকআর্থার ফিলিপাইনের বিচ্ছিন্ন মার্কিন বাহিনীকে আত্মসমর্পণের অনুমতি দিয়েছেন।

ফোনে ল্যারী বলেছে, উইলার্ড হোটেলে ডিনার, আজ সে ক্যাথরিনকে মজার একটা খবর দেবে। ভালো খবর? কেমন যেন ভয় হয় ক্যাথির। আয়নায় সে নিজেকে দেখে। ফিল্মস্টার ইনগ্রিড বার্গম্যান-এর মত সুন্দরী না হলেও সে বেশ সেক্সি। তার যুবতী শরীরের বাঁকগুলো যেকোনো পুরুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। কোনো পুরুষ এমন সেক্সি, বুদ্ধিমতী, হাসিখুশি, ভদ্র মেয়ে ছেড়ে যুদ্ধে মরতে চাইবেনা।

উইলার্ড হোটেলে না না করে শেষ অবধি একটা ড্রাই মারটিনির অরডার দিলো ক্যাথি।

ল্যারী বললো, 'ক্যাথি, দারুণ খবর। আমি বিদেশে যাচ্ছি।'

'খুব ভালো। দারুণ ভালো খবর।'

'তুমি কাঁদছো?'

'এতো ভালো খবর শুনলে এরকম হয়।'

'আমি স্কোয়াড্রন-লীডার হবো।'

'সত্যি? আর একটা ড্রিঙ্ক, কবে হবে?'

'এক মাস দেরী আছে। অনেক সময়। এখন কোথায় যাবে?'

'বাড়িতে। বিছানায়।' ক্যাথির সংক্ষিপ্ত জবাব।

পরবর্তী চারটে সপ্তাহ দ্রুত কেটে যায়। শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক ফ্রানজ কাফকার উপন্যাসের দুঃস্বপ্নের দৃশ্যের মতো দ্রুত ছুটছে ঘড়ির কাঁটা। মিনিট থেকে ঘণ্টা, ঘণ্টা থেকে দিন। আজ শেষ দিন। এয়ারপোর্টে স্বামীকে পৌঁছে দেয় ক্যাথি। প্লেনটা ছোট্ট বিন্দুর মতো হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবার পরেও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ক্যাথি।

সেন্সরের কারণে ল্যারীর চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে ও কোথায় আছে। ল্যারী জীবনকে ভালোবাসে। এবং মৃত্যুর মুখোমুখি লড়াই তার কাছে জীবন। হোয়াইট হাউস বিল ফ্রেজারকে যুদ্ধে যোগ দিতে দেয়নি। সে ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করে, 'ল্যারীর খবর কী!'

'ওর কাছে যুদ্ধ ফুটবল খেলার মতো। প্রথমে গোল খেয়েছি, এখন ভালো টিম ভালো খেলছে, এবার আমরা জিতবো। কিন্তু, যুদ্ধ তো ফুটবল খেলা নয়, বিল। যুদ্ধ শেষ হবার আগে লাখ লাখ মানুষ মরবে।'

'যারা যুদ্ধে যায়, তাদের কাছে যুদ্ধ ফুটবল খেলার মতোই।'

ক্যাথরিন যুদ্ধ সংক্রান্ত মহিলা সংগঠন ডবলিউ, এ, সি-তে যোগ দেয়। বিল ফ্রেজার তাকে ওয়ার বণ্ড বিক্রির প্রচেষ্টায় যোগ দিতে বলে। ওয়াশিংটন থেকে হলিউড ও ন্যুইয়র্ক, ক্যাথি অনবরত ঘুরছে। ওর সেক্রেটারী বলে, 'ফিল্মস্টার ক্যারী গ্রাণ্ট নাকি চমৎকার ব্যক্তিত্বের পুরুষ।'

ফ্রেজারের একটা অ্যাডভারটাইজিং অ্যাকাউণ্ট নিয়ে ওয়ালেস টারনারের মুশকিল হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করলো ক্যাথরিন। খুব খুশি হলো ক্লায়েণ্ট। কয়েক সপ্তাহ পরে আর একটা অ্যাকাউণ্ট। কয়েক মাসের মধ্যে ছটা অ্যাকাউণ্ট দেখছে ক্যাথরিন। পারসেণ্টেজ হিসেবে মোটা টাকা পাচ্ছে ক্যাথি।

শেষে বিল বললো, 'এখন থেকে তুমি এই ব্যবসায় আমার পার্টনার। গত ছ'মাসে তোমার জন্যে অনেক অ্যাকাউণ্ট পেয়েছি আমরা...'

'আমি রাজি'. বিলের গালে লম্বা চুমু খেলো ক্যাথি।

স্মৃতি বড় প্রতারক।

এগারো

প্যারী, ১৯৪৪। বিয়ের প্রস্তাব আর করেনা আরমাঁদ। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নাট্য ও চিত্রপরিচালক আরমাঁদ জানে, এখন সবার চোখে বুদ্ধিজীবী আরমাঁদের থেকে রূপসী অভিনেত্রী হেলেনের গুরুত্ব বেশী। খবরের কাগজে ইন্টারভিউয়ের সময় এখন আরমাঁদের সঙ্গে কথা না বলে হেলেনকেই নানা প্রশ্ন করে রিপোর্টাররা। কোথাও গেলে হেলেনকে নিয়েই হৈ চৈ হয়। ফ্রান্সে সবাই আরমাঁদকে ঈর্ষা করে।

ফেব্রুয়ারীর শুরু থেকে হেলেনের সালোঁতে ভিড় জমায়—রাজনীতি-বিদ, বিজ্ঞানী ও লেখকরা। পলিটিসিয়ানরা পলিটিক্স শেখায়, অর্থনীতি শেখায় ব্যাংকার, শিল্পবিশেষজ্ঞ শিল্পের সম্পর্কে বোঝায়, ব্যারণ রথসচাইল্ডের প্রধান মদ্যবিশেষজ্ঞ মদের ব্যাপারে নানা কথা বলে, এবং শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্থপতি করবুযিশিয়র শেখান স্থপতিবিদ্যা। কিন্তু কোনো পুরুষের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী নয় হেলেন।

পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দু-তিনজন কোটিপতিদের অন্যতম এই কনস্ট্যান্টাইন ডেমেরিস। প্রধানমন্ত্রী, কার্ডিন্যাল, রাষ্ট্রদূত বা রাজাকে টাকা দিয়ে কিনতে পারে ডেমেরিস। তার ক্ষমতা রূপকথার সম্রাটের মতো। পৃথিবীতে মালবাহী জাহাজের যতগুলো ফার্ম আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফার্মের মালিক এই কোটিপতি। তার প্রাইভেট এয়ারলাইন আছে।

আছে সংবাদপত্র, ব্যাংক, ইস্পাতের কারখানা, সোনার খনি। অক্টোপাশের শুঁয়ের মতো পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা ব্যবসা ছড়িয়ে আছে।

মাঝারী উচ্চতা, পিপের মতো বুক, চওড়া কাঁধ, চাপা ও চওড়া নাক। তবে জলপাইধূসর চোখে বুদ্ধির ছাপ। ওর ৫০০টা স্যুট আছে। স্যুট বানায় লণ্ডনের হজ অ্যানড কারটিস, শার্ট রোমের ব্রিয়নি এবং জুতো প্যারীর দালিয়েৎ গ্রাঁদে।

'মিষ্টার ডেমেরিস, ব্যবসায়ী হিসেবে সাফল্যের জন্যে আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ?' সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে।

'সাধারণ সাফল্যের জন্য শত্রু মারা দরকার।' সোজা সাপটা জবাব ডেমেরিসের।

'কতো কর্মচারী আপনার অধীনে কাজ করে?'

'কেউ না। ওরা কর্মচারী নয়, সহ-উপাসক। যেখানে এতো টাকা, এতো ক্ষমতার ব্যাপার, ব্যবসা সেখানে ধর্ম এবং অফিস মানেই মন্দির।'

'আপনি সংগঠিত ধর্মে বিশ্বাস করেন?'

'ভালোবাসার নামে যতো অপরাধ ঘটে, ঘৃণার নামে ঘটে না। তাই সংগঠিত ধর্মে আমার অবিশ্বাস?'

এবং যেখানেই ডেমেরিস, সেখানেই রূপসী যুবতী। গ্রীক ব্যাংকারের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে ডেমেরিস। অথচ তার প্রাইভেট দ্বীপে বা প্রমোদপোতে যখন সে বেরাতে যায়, তার সঙ্গে থাকে রূপসী অভিনেত্রী বা ব্যালেরিনা, ডজন ডজন ফিল্মস্টার, বন্ধুর বউ, পনেরো বছর বয়সের মহিলানভেলিস্ট, সদ্য বিধবা ইত্যাদি। একবার নতুন কনভেণ্টের জন্যে টাকা পাবার আশায় নাকি একদল খৃষ্টান ধর্মযাজক তার সঙ্গে শুতে চেয়েছিলো।

ডেমেরিসের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে আধ ডজন বই। কিন্তু, সত্যিকারের মানুষটাকে কেউ চেনেনা। পিরীয়াস-এর স্টিভিডোরের চৌদ্দটা ছেলেমেয়ের একজন এই কনস্ট্যানটাইন। গরীবের ঘরে খাবার নেই। খাবারের জন্য মারামারি করতো ভাইবোন। ডেমেরিস যখন ছোট, তখনই অঙ্কের ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ। পারমেনন-এর সিঁড়ির কটা ধাপ, সমুদ্রের বুকে কটা নৌকা, ক'মিনিটে স্কুলে যাওয়া যায়। অদ্ভুদ এক প্রতিভা! বুদ্ধির খেলায় সবাই হার মানে তার কাছে।

আজ তার কাছে পৃথিবী কেনাবেচার এক বাজার। মানুষ হয় ক্রেতা নয়, বিক্রেতা। মেয়েরা আসে, টাকার লোভে, ক্ষমতার লোভে। সবাই কিছু চায়। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চায় দান। কেউ বা চায় বন্ধুত্ব, যা ক্ষমতারই সমান। কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। আপাদদৃষ্টিতে সে ভদ্র, সভ্য, শহুরে মানুষ। ভেতরে ভেতরে সে এক আততায়ী, হিংস্র এক খুনী যে ঘাড়ের শিরায় আঘাত হানতে চায়।

বিচার ও প্রতিশোধের ভাবনাই ডেমেরিসকে আবিষ্ট করে রাখে। জীবনে অনেকেই তাকে দুঃখ দিয়েছে। সেই দুঃখের ঋণ শতগুণ ফিরিয়ে দিয়েছে ডেমেরিস।

মাত্র ষোল বছর বয়সে স্পাইরস নিকলস নামের বয়স্ক এক গ্রীক ভদ্রলোকের সঙ্গে জীবনের প্রথম ব্যবসায় নামলো ডেমেরিস।

ডকে নাইট শিফটের স্টিভিডোরদের কাছে গরম খাবার বেচার ব্যবসা।

আইডিয়া ডেমেরিসের। এবং অর্ধেক পুঁজি তার। অথচ ব্যবসা সফল হতেই তাকে তাড়ালো স্পাইরস। বিনা প্রতিবাদে অন্য ব্যবসায় ঢুকলো ডেমেরিস। কুড়ি বছর পরে, যখন মাংস প্যাকের ব্যবসায় ধনী স্পাইরস নিকলস কতকগুলো রিটেল শপ খুলবে বলে লোন নিতে চাইলো,

'ডেমেরিসের ব্যাংক বস সুদে ধার দিলো। এবং যখন টাকা ব্যবসায় ঢেলেছে স্পাইরস, ব্যাংক হঠাৎ টাকা ফেরৎ চাইলো। মামলায় দেউলিয়া হলো স্পাইরস। পরের দিন আত্মহত্যা করলো নিকলস স্পাইরস।

'যারা ডেমেরিসের সঙ্গে অন্যায় করেছে, তাদের জন্য প্রতিশোধ। উপকারীর জন্যে প্রত্যুপকার। গরীব যুবক ডেমেরিস ভাড়া দিতে পারতোনা। তবু ল্যাণ্ডলেডী তাকে খাওয়াতো, পোষাকের খরচা দিতো। আজ সেই ল্যাণ্ডলেডী এক অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এর মালিক। কে তাকে এসব দান করলে, তার নাম জানেনা ল্যাণ্ডলেডী। গরীব যুবকের শয্যাসঙ্গিনী ছিলো এক গরীব যুবতী, যুবককে সে আশ্রয় দিয়েছিলো। এখন সেই যুবতী ভিলার মালিক। মাসে মাসে সে পেনসন পায়। কোথা থেকে পেয়েছে ও এসব, ও জানেনা। চল্লিশ বছরে বহু ব্যাংকার উকিল জাহাজের ক্যাপটেন, ইউনিয়নের নেতা, রাজনীতিজ্ঞ বা ব্যবসায়ী তার সংস্রবে এসেছে। কেউ সাহায্য করেছে। কেউ ঠকিয়েছে। কিছুই ভোলেনি ডেমেরিস। উপকারীর জন্যে উপকার। যে প্রবঞ্চনা করে, যে দুর্ব্যবহার করে, তার জন্যে প্রতিশোধ।'

শ্রী মেলিনা বলে, 'তুমি ঈশ্বর হতে চাও?'

'প্রত্যেক মানুষেই ঈশ্বর হতে চায়। কেউ পারে, কেউ পারেনা।'

'কোসটা, মানুষের জীবন এভাবে ধ্বংস করা অন্যায়।'

'অন্যায় নয়, বিচার।'

'বিচার নয়, প্রতিশোধ।'

'অনেক সময় দুটো একই। অন্যায় করে অনেকে শাস্তি পায়না। আমার শাস্তি দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে।'

যখন ডেমিরিসের তিনটে মোটে মালবাহী জাহাজ ছিলো, আরো জাহাজ কেনার জন্য সুইজারল্যাণ্ডের এক ব্যাংকারের কাছ থেকে লোন চেয়েছিলো যুবক ডেমেরিস। লোকটা নিজেও দিলোনা, বন্ধুদের ফোন করে বারণ করলো। শেষ অবধি তুরস্ক থেকে লোন জোগাড় করেছিলো ডেমেরিস।

প্রতিশোধের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে ডেমেরিস। ব্যাংকারের সব থেকে বড় দুর্বলতা ওর লোভ। ডেমেরিস ফাঁদ পাতলো। এজেণ্ট মারফৎ খবর গেলো ব্যাংকারের কাছে। সৌদি আরবের ইবন সৌদের তেল সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে কোটি কোটি ডলার ঢালতে চাইছে ডেমেরিস। যদি পঞ্চাশ লাখ ডলার ঢালতে পারে ব্যাংকার, তার অনেক লাভ হবে। ব্যাংকের টাকা বেআইনীভাবে কাজে লাগিয়ে শেয়ার কিনলো ব্যাংকার। চেকটা দেখলো ডেমেরিস। তারপর খবরের কাগজে ঘোষণা করলো, প্ল্যান বাতিল। শেয়ারের দাম ঝপ করে কমে গেলো। তহবিল তছরূপের দায়ে কুড়ি বছরের জেল হলো ব্যাংকারের। তার শেয়ারগুলো কমদামে কিনে নিলো ডেমেরিস। কয়েক সপ্তাহ পরেই ঘোষণা, তেলের ব্যবসায় সত্যিই নামছে ডেমেরিস। শেয়ারের দর চড়ে গেলো।

এখনো অনেকের ওপর তার প্রতিশোধ নেওয়া বাকী। আজকাল কেউ তার সঙ্গে শত্রুতা করতে সাহস করে না।

এই কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস একদিন কায়রো যাবার পথে প্যারীতে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার জন্য এক ফরাসী মহিলা ভাস্করের সঙ্গে গেলো হেলেনের সালোঁয়। ওকে প্রথম দেখেই তার ভেতর কামনা জেগে ওঠে।

তিন দিন পরে বিনা নোটিশে অভিনয় বন্ধ করে কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিসের সঙ্গে গ্রীসে গেলো হেলেন।

বিখ্যাত অভিনেত্রী। আর পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী কোটিপতিদের একজন।

খবরটা ছাপা হলো নানা খবরের কাগজে।

মেলিনা ডেমেরিস রিপোর্টারদের বললো, 'আমার স্বামী বিরাট মানুষ। পৃথিবীর নানা প্রান্তে বান্ধবী জুটবে এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।'

কনস্ট্যানটিনোপল, টোকিও, রোমে কোস্টার সঙ্গে হেলেন। ফটো ছাপা হয় খবরের কাগজে। কিন্তু, মেলিনা তার স্বামীকে ভালো-বাসে। কোনো কোনো পুরুষের বহু নারীসঙ্গের প্রয়োজন আছে। মেলিনা কস্ট্যানটাইন ছাড়া অন্য পুরুষকে নিজের শরীর ছুঁতে দেওয়ার আগে মরে যাবে। কিন্তু কনস্ট্যানটাইন স্ত্রীকে ভালবাসলেও অন্য মেয়েদের সঙ্গে শুতে চায়। এতে বাধা দিলে বিয়েটা ভেঙে যায়। অপমান সহ্য করে মেলিনা। সে ডেমেরিসকে ভালোভাসে। ডেমেরিসের চাহিদা সে সাধ্যমত মেটানোর চেষ্টা করে। হয়তো পারেনা হেলেন কিভাবে পুরুষের চাহিদা মেটায় শুনলে আতংকিত হতো মেলিনা। এবং ওসব তার স্বামীর ভালো লাগে জানলে সে দুঃখিত হতো।

এই প্রথম এমন মেয়ের দেখা পেয়েছে ডেমেরিস, যে সেক্সের ব্যাপারে এতো জানে, এতো সুখ দিতে পারে। প্রতিদানে ও কিছু চায় না। পোরতোলিনোর উপসাগরের সৈকতে দামী ভিলা উপহার দিলে যতো খুশি, এথেন্স শহরের পুরোনো এলাকায় ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনে দিলেও তেমনি খুশি।

চমৎকার রাঁধতে পারে। পেন্টিং ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে দারুণ জ্ঞান। এক তরুণ কিউরেটরের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ও রেমব্রঁদের পেনটিং বেচতে চায়।

'সুন্দর,' ডেমেরিস বলে।

'কতো দাম ? কোথায় পেলে ?' হেলেন জানতে চায়।

'আড়াই লাখ ডলার দিয়েছি ব্রাসেলসের প্রাইভেট ডিলারকে।

'কোস্টা, মালিকের কাছ থেকে কিনলে সস্তা বলতাম।' হেলেন বলে।

'ছবিটা যদি আসল হয়, ওটা স্পেনের ডিউক অফ টলেডোর সম্পত্তি। ওরা দর হেঁকেছে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড।'

সত্যিই তাই। পেন্টিং ফেরৎ দিলো ডেমেরিস। কিউরেটর ও আর্ট ডিলারের জেল হলো।

অথচ কিউরেটরকে ব্ল্যাকমেল করলে মোটা টাকা কামাতে পারতো হেলেন। পরের দিন পান্নার দামী নেকলেস ওকে কিনে দিলো ডেমেরিস। একটা লাইটার উপহার পেলে যতোটুকু খুশী হতো, ঠিক ততোটুকুই খুশী হলো হেলেন।

এখন অন্য রক্ষিতাদের একে একে বিদায় দিয়েছে কোটিপতি ডেমেরিস। প্রচুর টাকা দেওয়ায় তারা প্রতিবাদ করেনি। একশো পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা চারটে জি এম ডিজেল ইঞ্জিনে চালানো প্রমোদ-প্রোতের মালিক এই ডেমেরিস। তার বুকে সীপ্লেন, চব্বিশ জন নাবিক, দুটো স্পীড বোট, মিষ্টি জলের সুইমিংপুল। বারটা ঘর, দামী পেন্টিং ও শিল্পসামগ্রীতে সাজানো।

মার্সেইয়ে যে ছোট্ট গরীব মেয়ে স্বপ্নে জেলে ডিঙিগুলোকে তার নৌবহর মনে করতো আজ তার প্রেমিক ডেমেরিস কতো জাহাজের মালিক।

অথচ ডেমেরিসের খ্যাতি বা অর্থ তাকে অভিভূত করে না। দৈত্যের মতো ইচ্ছাশক্তি এবং প্রখর বুদ্ধি—এ দুটো তার চোখ এড়ায় না। আড়ালে আছে নিষ্ঠুরতা। যে নিষ্ঠুরতা হেলেনেরও অস্তিত্বের গভীরে লুকিয়ে আছে।

ফিল্মে ও নাটকে তার আর উৎসাহ নেই। নিজের জীবনের নাটকে সে নায়িকা এবং এই নাটক চিত্রনাট্যকারের লেখা চিত্রনাট্যের চেয়ে অনেক বেশী জীবন্ত। রাজা, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূতরা তাকে আজ গুরুত্ব দেয়। কেননা সে ডেমেরিসের সঙ্গিনী।

সমুদ্রের মাঝখানে কনস্ট্যান্টাইন ডেমেরিসের দ্বীপ। দ্বীপ নয়, স্বর্গোদ্যান। পাহাড়ের চূড়ায় ভিলা, অতিথিদের জন্য এক ডজন কটেজ শিকারের ব্যবস্থা, কৃত্রিম হ্রদ, বন্দর, এয়ারফিল্ড। আশিজন কর্মচারী ও সশস্ত্র প্রহরী। হেলেন এখানে কনস্ট্যাটাইনের সঙ্গে একা থাকতে পারলেই খুশী। ডেমেরিসের মনে খুশির ভাব জেগে ওঠে। কিন্তু হেলেন এক পুরুষের কথা সবসময় ভাবে, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয় ডেমেরিস জানলে ও নিশ্চয়ই অবাক হতো।

মাসে একবার এসে ডিটেকটিভ ক্রিশ্চিয়ান বারবেইৎ-এর সঙ্গে দেখা করে হেলেন। এখন মোটা টাকা পাচ্ছে ডিটেকটিভ। তার আশা পরে ল্যারী ডগলাসের ব্যাপারটা কনস্ট্যান্টাইনকে বলার ভয় দেখিয়ে এই মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা কামাবে।

স্বামীর কাছ থেকে ক্যাথরিন যে চিঠি পায়, তাতে পোষ্ট অফিসের নাম থাকে না।

হেলেন খবর পায়, '৪৮ নম্বর ফাইটার স্কোয়াড্রনের লীডার এখন ক্যাপটেন ল্যারী ডগলাস।'

স্ত্রী চিঠি পায়, 'বেবী, এইটুকু বলতে পারি যে আমরা এখন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে…'

হেলেন খবর পায়, 'ও এখন গুয়ামের কাছে।'

'মিস হেলেন, তোমার বন্ধু এখন পি থারটি এইট, এবং পি ফিফটি ওয়ান প্লেনের পাইলট।'

'বেবী, ফিরে এসে তোমায় একটা সুখবর দেবো…

'মিস হেলেন, তোমার বন্ধু ডি, এফ, সি পদক পেয়েছে। সে এখন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল।'

স্বামী নিরাপদে ফিরুক। প্রার্থনা করে ক্যাথি।

ল্যারী নিরাপদে ফিরুক। প্রার্থনা করে হেলেন। ওদের দুজনের কামনা, ল্যারী ফিরুক।

বারো

ওয়াশিংটন, ১৯৪৫-৪৬। ১৯৪৫'র ৭ই মে ফ্রান্সে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করলো নাৎসী জারমানী। পৃথিবীর বুকে এক হাজার বছর ধরে ফ্যাসীবাদী নাৎসী শাসন চালানোর স্বপ্ন শেষ হলো।

এখন সবার দৃষ্টি দূর প্রাচ্যের দিকে। জাপানীরা বেঁটে, মজার লোক। জাপানীরা কাছের জিনিস চোখে দেখতে পায়না। অথচ জাপানীরা যেভাবে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়ছে মনে হচ্ছে যে এই বিশ্বযুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে।

তারপর…

৬ই আগস্ট হিরোশিমায় আণবিক বোমার বিস্ফোরণে কয়েক মিনিটের মধ্যে মরে গেলো একটা বড় শহরের প্রায় সব মানুষ।

তিনদিন পরে...

৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় আণবিক বোমা। ফল আরো মারাত্মক!

সভ্যতার প্রগতির চরম মুহূর্ত। সেকেণ্ডে কত লক্ষ মানুষ মারা যায় তা হিসেব করা যাচ্ছে। জাপানীদের সহ্য শক্তিও ভেঙে পড়লো। জাপান সরকার নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করলো জেনারেল ম্যাক আর্থারের কাছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলো।

পরের দিন বিল ফ্রেজার জানালো, 'ক্যাথি, তোমার ফোন...

'হ্যালো...'

'হ্যালো মিসেস ল্যারী ডগলাস?'

'হ্যাঁ, আপনি.....'

'অন্য এক কণ্ঠস্বর "হ্যালো, ক্যাথি?'

'লারী? ল্যারী তুমি কোথায়?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে। ঘরে ফিরছি। ক্যাথি তুমি কাঁদছো?'

'হ্যা, আমি কাঁদছি।'

লাইনে অন্য পুরুষের স্বর, 'স্যরি, লাইনটা কেটে দিতে হবে।'

'ল্যারী, তোমার প্রমোশন হয়েছে? তুমি কর্ণেল?'

'তুমি মাথা গরম করবে বলে বলিনি।'

'ও ডার্লিং!'

লাইন কেটে যায়।

বিল ফ্রেজার কতো কষ্ট করে কর্ণেল ল্যারী ডগলাসের সঙ্গে তার বউয়ের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ক্যাথি জানে। সে কৃতজ্ঞ। ল্যারীর পর মনের মতো মানুষ বলতে যদি কেউ থাকে, সে বিল।

রাত দুটোয় চোখ খুলে ক্যাথি দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে ল্যারী। ওকে জড়িয়ে ধরে ক্যাথি। ওর মুখের রেখাগুলো কেমন যেন বদলে গেছে। ইউনিফর্ম, শর্টস খুলেছে ল্যারী। যেন অচেনা পুরুষ তার শরীরের গোপন গভীরে ঢুকছে। আঘাত দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে বন্য জন্তুর মতো।

ল্যারী বদলে গেছে। আদরটাদরের ধার ধারেনা আজকাল। তার যৌন ব্যবহার বন্য আক্রমণের মতো। যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে, যেন শাস্তি দিচ্ছে। যেন স্বার্থপর, নিষ্ঠুর এক পুরুষ। অথচ দীঘল, পেশীবহুল শরীর গভীর কালো চুল, সুন্দর মুখ। ভবিষ্যতের কথা কী ভাবছে ল্যারী।

'না, সেনাবাহিনীতে আর ফিরে যাবোনা। ওটা বোকার কাজ।'

সমস্যাটার কথা বিলকে বলে ল্যারী।

আজকাল বড্ড সহজে চটে যায় ল্যারী। ক্যাথি অফিস থেকে ফিরে দেখে, ও ফ্ল্যাটে বসে আছে। এতক্ষণ কী করছে, কিছু বলেনা। জিজ্ঞাসা করলে রেগে যায়।

'বিল, কোনো কাজ করছেনা ল্যারী। এটা ঠিক নয়। ওর একটা চাকরী দরকার।'

'বিমান বাহিনীর।'

'ও ফিরে যাবেনা।'

'পান অ্যামে আমার বন্ধু আছে। চেষ্টা করে দেখি।'

ফিফথ এভিনিউ ও ফিফটিথার্ড স্ট্রীটে প্যান আমেরিকান হেডকোয়ার্টার্স। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ক্যারল ইস্টম্যানের চোয়াল লম্বা, ধারালো চোখে হিজলের রং। সে বলে, 'ন্যুইয়র্কে ট্রেনিং, গ্রাউণ্ড স্কুল চার সপ্তাহ তারপর চার সপ্তাহ ফ্লাইট ট্রেনিং। মাইনে, মাসে সাড়ে তিনশো ডলার। ট্রেনিং শেষ হলে প্লেনের নেভিগেটর।'

'পাইলট কবে হবো?'

'সিনিয়র হলে। সোমবার সকালে নটায় ট্রেনিং বেসে যেও।'

এথেন্স, ১৯৪৬। গ্রীক কোটিপতি কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিসের ব্যক্তিগত হকার সিডেলী প্লেনে ষোলজন প্যাসেঞ্জার আরামে বসতে পারে। স্পীড ঘণ্টায় ৩০০ মাইল। ক্রু চারজন। প্লেন নয়, যেন প্রাসাদ। ডেকোরেশন ঃ ফ্রেডরিক সরিন। দেয়ালে মুর‍্যাল এঁকেছেন স্বয়ং শাগাল। একটা ঘর বেডরুম, একটা রান্নাঘর।

পাইলট দুজন। একজন গ্রীক। নাম, পল মেটাকসাস। হাসিখুশি মোটাসোটা। আগে মেকানিক ছিলো ব্যাটল অফ ব্রিটেন রয়্যাল এয়ার ফোর্সে কাজ করেছে। সেখানেই আয়ান হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে পরিচয় লম্বা, রোগা, মাথায় লাল চুলের হোয়াইটস্টোনের ভঙ্গী দুষ্টু ছেলের মুখোমুখি স্কুলমাস্টারের মতো। হাওয়ায় ভাসলে তবে বোঝা যায়, সে এক অসাধারণ প্রতিভাবান পাইলট।

কর্নেল ল্যারী ডগলাস আর, এ, এফ ছেড়ে মার্কিন বিমানবহরে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত একই স্কোয়াড্রনে কাজ করেছে ও আর হোয়াইটস্টোন। মেটাকসাস আর, এ, এফ-এ যোগ দেবার আগেই আমেরিকা ছেড়ে যায় ল্যারী। তাই ওর সাথে পরিচয় হয়নি।

সব শুনে নিয়ে হোয়াইটস্টোনের সঙ্গেই বেশী আলাপ জমায় হেলেন। হোয়াইটস্টোনের ভাই অষ্ট্রেলিয়ায় ছোট্ট ইলেকট্রনিকস ফার্ম খুলেছে। হোয়াইটস্টোনের ইলেকট্রনিকসে আগ্রহ। কিন্তু তার পুঁজি নেই।

প্যারীতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ক্রিশ্চিয়ান বারবেইৎকে হেলেন বলেছে, 'যেদিন কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস তোমার নাম করবে, সেদিন ওকে বলবো, 'তোমার সর্বনাশ করতে।'

'না, মাদমোয়াজেল···আমি কথা দিচ্ছি ··রিপোর্টটা পড়ুন···'

অ্যাকমী সিকিউরিটি এজেন্সি

১৪০২ ডি স্ট্রীট

ওয়াশিংটন ডি, সি

রেফারেন্স ঃ ২-১৭৯-২১০ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

প্রিয় মসিয়ঁ বারবেইৎ,

ল্যারী ডগলাস যুদ্ধবিমানের পাইলট হিসেবে ভালো। কিন্তু সে শান্তির সময় প্যান আমেরিকানের মতো বড় সংগঠনের মধ্যে ডিসিপ্লিন বজায় রেখে চলবে কিনা, এ সম্বন্ধে প্যান আম-এর পারসোনাল অফিসের সন্দেহ আছে। আজকাল সে অনেক মেয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। নাম ঠিকানা নিচে দেওয়া হলো। বিল সঙ্গে দেওয়া হলো।

একান্ত বিশ্বস্ত

আর রুটেনবার্গ

ম্যানেজিং সুপারভাইজার।

এমন এক মেয়েকে বিয়ে করেছে ল্যারী যাকে সে ভালবাসেনা। ওকে কাছে আনবেই হেলেন। তার আগে···

'আয়ান হোয়াইটস্টোন, তুমি তো বলেছিলে যে ইলেকট্রনিক কোম্পানীর মালিক হতে চাও ?'

'ওসব সপ্ন, মিস পেইস। অতো টাকা কোথায় ?'

'আমার চেনা এক বন্ধু টাকা দিতে চায়। কথাটা ভেবে দেখো।'

'মিষ্টার ডেমেরিস একথা জানেন ?'

'তোমার মতো ভালো পাইলটকে কখনো ছাড়বেনা ডেমেরিস, কথাটা আমাদের মধ্যেই থাক।'

ওয়াশিংটন : প্যারী : ১৯৮৬ 'আমার শুনে নার্ভাস লাগছে —ইস্টম্যান বলে।

'আমারও। এই ল্যারী ডগলাস লোকটার ভেতরে যেন ডিনামাইট পোরা আছে। যে কোনো মূহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।'— চীফ পাইলট স্যাল সাকোউজ বোঝায়।

'হয়তো ট্রেনিং-এ ছাঁটাই হয়ে যাবে।'

'এই জাতের বেড়াল ট্রেনিং-এ নিজের ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট হয়।'

নির্ভুল আন্দাজ চীফ পাইলটের। নেভিগেশন, রেডিও, কম্যুনিকেশনস, ম্যাপ রীডিং, ইনস্টমেণ্ট ফ্লাইং-এর ক্লাস। এয়ার প্লেন ককপিটের ছোট্ট মডেল লিংক ট্রেনারের সামনেটা কালো হুডে ঢাকা রেখে ট্রেনী পাইলটকে চোখে কিছু না দেখে স্টল, লুপ, স্পিন ও রোল করতে হয়। যদিও লিংক সেটশন হাওয়ায় উড়ছেন, গতিবেগ বাড়লে ঝড় এলে, পাহাড় সামনে এলে পাইলট কী করবে তার পরীক্ষা হয়ে যায়। ছাত্র হিসেবে ল্যারী ডগলাসের তুলনা নেই। সে সবকিছু শেখে। কিছুতেই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনা। একদিন রাতে ল্যারীকে

একা ডি সি-থ্রোর বিমানের পরীক্ষা করতে দেখে চীফ পাইলট বলে, 'বলেছিলামনা, কুত্তার বাচ্চা আসলে আমার চাকরীটাই চায়।'

যেভাবে শিখছে, তাতে অসম্ভব নয়।'—ইষ্টম্যান হাসে।

গ্র্যাজুয়েশনে উৎসবে ন্যুইয়র্ক থেকে প্লেনে এলো ক্যাথরিন।

সে রাতে ক্যাথি, ল্যারী, অন্য চারজন বন্ধু ও তাদের বউরা টোয়েনটিওয়ান ক্লাবে ডিনার খেতে যেয়ে দেখে রিজারভেশন ছাড়া ভেতরে ঠাঁই নেই। ক্যাথি ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলে, 'জায়গা পাওয়া গেছে। জেরী বার্ণসকে বললাম, আমি উইলিয়ম ফ্রেজারের পার্টনার।'

ল্যারী জ্বলে উঠে, 'ফাক দেম। আমরা এখানে খাবোনা।' তার পর সিক্সথ এভিনিউ-এর ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় ফালতু ডিনার সেরে ঘরে ফিরে ল্যারী বলে, 'বিল ফ্রেজারের জন্যে আমার চাকরী। বিল ফ্রেজারের জন্যে তোমার ব্যবসা। এখন বিল ফ্রেজারের নাম না করলে রেস্তোরাঁয় জায়গা পাওয়া যায়না। আমার আর সহ্য হয়না।

ক্যাথি বোঝে, বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে হলে ল্যারীকে গুরুত্ব দিতে হবে। আগে ল্যারী, পরে সবকিছু। ল্যারীর ভেতর ইর্ষা ঢুকে গেছে।

'ক্যাথি, তুমি আমায় কোনোদিন ছেড়ে যেওনা।'

'ডার্লিং আমি কখনো তোমায় ছেড়ে যাবোনা।'

এখন ওয়াশিংটন থেকে প্যারীগামী ফ্লাইট ১৪৭'র নেভিগেটর ল্যারী ডগলাস। আগে থেকে খবর না দিয়ে একদিন সে ক্যাথিকে প্লেনে নিয়ে যায় প্যারীতে, ম্যাকসিমে ডিনার খেতে। ক্যাথির অনেক কাজ ছিলো। তবু সে খুশি হওয়ার ভান করে। ল্যারী তার স্বামী প্রথমে ল্যারী, তারপর অন্য সবকিছু।

অফিসে বসে রিপোর্ট দেখছিলো চীফ পাইলট, ল্যারী ভেতরে ঢুকে বলে, মর্ণিং চীফ।'

'বসো, ল্যারী। গত সোমবার প্যারীর ফ্লাইটের জন্যে ওখানকার এয়ারপোর্টে যখন তোমার আসার কথা, তার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে এসেছো তুমি?'

'রাস্তায় দেরী হয়েছিলো, প্লেন তো ঠিক সময়েই ছেড়েছে। এটা বাচ্চাদের ক্যাম্প নয় যে...'

'এটা এয়ারলাইনস। এখানে নিয়ম মেনে চলা জরুরী। 'তাছাড়া ক্যাপটেন স্যুইফটের ধারণা ফ্লাইংয়ের আগে তুমি মদ খেয়েছিলে?'

'ও মিথ্যাবাদী। বুড়ো কুত্তার বাচ্চা দশ বছর আগে রিটায়ার করা উচিৎ ছিলো। 'ওর ধারণা, ওর চাকরীটা আমি কব্জা করবো।'

ল্যারী, তুমি এ পর্যন্ত আমাদের চারজন ক্যাপ্টেনের অধীনে কাজ করেছো। কে ভালো?'

'কেউ নয়।'

'এবং ওরাও তোমায় পছন্দ করেনা।'

'ওরা যখন আরামদায়ক চাকরীতে মোটা টাকা কামাচ্ছিলো, আমি তখন জারমানী ও সাউথ প্যাসিফিকে মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিমান উড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছি, প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি...

'ফাইটার প্লেনের তুমি ভালো পাইলট। কেউ অস্বীকার করছেনা। প্যাসেঞ্জার প্লেনের ব্যাপারটা অন্যরকম।'

'বুঝেছি। কয়েক মিনিট পরেই আমার ফ্লাইট। আমি যেতে পারি?'

'ওই ফ্লাইটে তোমার জায়গায় অন্য লোক যাবে। তোমার চাকরী খতম।'

'চাকরী দিয়েছিলে কেন?'

'তোমার স্ত্রীর বন্ধু বিল ফ্রেজারের খাতিরে।'

সোজা উঠে দাঁড়িয়ে চীফ পাইলটের মুখে ঘুষি মারলো ল্যারী। জবাবে ল্যারীকে দুটো ঘুষি মেরে চীফ পাইলট বললো, 'গেট আউট।'

'ইউ সন অফ এ বিচ। তুমি পায়ে ধরলেও আমি তোমার কোম্পানীতে চাকরী করবো না।'

দশ মিনিট পরে চীফ পাইলট ইষ্টম্যানকে বললো, 'ল্যারী ডগলাস অসুস্থ মানসিকতার মানুষ। চটে গেলে কখন কী করে বলা যায়না। তাই ইচ্ছা করেই আজ ওকে চটিয়ে দিয়েছিলাম। ও কী করে, দেখার জন্যে। ও মাথা গরম না করলে ওকে আর একটা চান্স দিতাম। কয়েকদিন আগে আর, এ, এফ-এ কাজ করতো এমন একজন পাইলট একটা গল্প বললো। ডগলাসের স্কোয়াড্রনের ক্লার্ক বলে একজন পাইলটের বাগদত্তা ইংরেজ যুবতীর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিলো ল্যারী। ঈগল স্কোয়াড্রন বেড়ে যেয়ে বোমা ফেলে ফিরে আসার সময় ল্যারীর প্লেন ছিলো সবার পেছনে। হঠাৎ জারমানদের গুলিতে ক্লার্কের প্লেন নিচে পড়ে গেলো। আর, এ, এফ-এর ওই পাইলটের মতে, জারমানরা গুলি করেনি। গুলি করেছিলো ল্যারী ডগলাস। ক্লার্ক মরলো। তারপর তার বাগদত্তা সেই ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে ভাব জমালো ল্যারী। আমেরিকায় আসার আগে মেয়েটাকে ও ছেড়ে এসেছে। ল্যারীর বউয়ের জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

ক্যাথির কনফারেন্স রুমে ঢুকলো ল্যারী। গালে হাত, চোখ ফুলে উঠেছে।

'ক্যাথি, আমি প্যান অ্যাম-এর চাকরী ছেড়ে দিলাম। ওরা বলেছিলো, তুমি বিল ফ্রেজারের প্রেমিকা। তাই ওরা আমায় চাকরী দিয়েছে।'

'দুশ্চিন্তা কোরোনা, ডার্লিং। তুমি অন্য এয়ারলাইনে চাকরী পাবে।'

কিন্তু অনেকে ইনটারভিউয়ে ডাকলেও কেউ চাকরী দিচ্ছেনা ল্যারীকে, ফ্রেজার সাহায্য করতে চাইলেও ধন্যবাদ জানিয়ে ওকে বারণ করলো ক্যাথি।

কয়েকটা চিঠি।

প্রথম চিঠি ঃ

একমী সিকিউরিটি এজেন্সী

১৪০২ ডি, ষ্ট্রীট

ওয়াশিংটন, ডি, সি

রেফারেন্স ২-১৭৯-২১০ ১লা এপ্রিল, ১৯৭৬

প্রিয় মসিয়ঁ বারবেইৎ,

১৫ই মার্চের চিঠি ও ব্যাংক ড্রাফটের জন্য ধন্যবাদ। প্যান আমের চাকরী যাওয়ার পরে ল্যারী ডগলাস এখন লং আইল্যাণ্ডের মালবাহী ফ্লাইং হুইল ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানীতে। ওদের ব্যাংক একাউন্ট ন্যুইয়র্কের ব্যাংক অফ প্যারীতে। ওই ব্যাংকের ভাইসপ্রেসিডেন্টের ধারণা, কোম্পানীর ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। ব্যাংকের কাছে কোম্পানীর ধার এখন ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ডলার। আরো প্লেন কেনার জন্য টাকা দিচ্ছে ব্যাংক। এবং ফ্লাইং হুইলের পারসোনেল ম্যানেজারের ধারণা, ল্যারী খুব ভালো পাইলট। ইতি—

আর র‍্যাটেনবার্গ

ম্যানেজিং সুপারভাইজার

দ্বিতীয় চিঠি ঃ

ব্যাংক অ্যাণ্ড প্যারী
ন্যুইয়র্ক

ফিলিপ শার্দ
প্রেসিডেণ্ট

প্রিয় হেলেন,

ফ্লাইং হুইলের ব্যাপারে যা করতে বলেছিলে, করেছি। কোষ্টাকে শুভেচ্ছা জানিও। তোমার কথামত ব্যাপারটা গোপন থাকবে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে
ফিলিপ

তৃতীয় চিঠি ঃ

একমী সিকিউরিটি এজেন্সী
১৪০২ ডি, ষ্ট্রীট
ওয়াশিংটন ডি, সি

রেফারেন্স ২-১৭৯-২১০ ২৯শে মে, ১৫৪৬

প্রিয় মসিয়ঁ বারবেইৎ,

ফ্লাইং হুইলস ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে ল্যারী ডগলাস? কারণটা কেউ বলছেনা। আমি খোঁজ নিচ্ছি।

ইতি—
আর ক্লাটেনবার্গ
ম্যানেজিং সুপারভাইজার

চতুর্থটা কেবল ঃ

কেব্‌লগ্রাম

ক্রিশ্চিয়ান বারবেইৎ. কেবল ক্রিশবার, প্যারী, ফ্রান্স। আপনার কেবল অনুযায়ী ল্যারীর চাকরী কেন গেলো সে সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া বন্ধ করে অন্য সব ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি।

আর ক্যাটেনবার্গ

একমী সিকিউরিটি এজেন্সী

পাঁচ নম্বরটা আবার চিঠি ঃ

একমী সিকিউরিটি এজেন্সী

১৪০২ ডি. ষ্ট্রীট

ওয়াসিংটন ডি. সি

রেফারেন্স ২-১৭৯-২১০ ১৬ই জুন, ১৯৪৬

প্রিয় মসিয়ঁ বারবেইৎ,

১৫ই জুন ওয়াশিংটন, বোষ্টন ও ফিলাডেলফিয়ার মধ্যে ফ্লাইট পাইলটের চাকরী পেয়েছে পাইলট লারী ডগলাস। আগামী দুমাসের মধ্যে এয়ারলাইনকে মোটা অঙ্কের ঋণ দেবে ডালাস ফার্ষ্ট ন্যাশনাল ব্যাংক। গ্লোবাল এয়ারলাইন্সে ল্যারীর সম্বন্ধে সবারই উঁচু ধারণা।

আর ক্যাটেনবার্গ

ম্যানেজিং সুপারভাইজার

ছ'নম্বর চিঠি ঃ

একমী সিকিউরিটি এজেন্সী

১৪০২ ডি, ষ্ট্রীট

ওয়াসিংটন, ডি, সি

রেফারেন্স ঃ ২-১৭৯-২১০ ২০শে জুলাই, ১৯৪৬

প্রিয় মিসয়ঁ বারবেইৎ,

ডালাস ফ্যার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক হঠাৎ কোন কারণে লোন দিতে রাজি না হওয়ায় এখন গ্লোব্যাল এয়ারওয়েজ বন্ধ। ল্যারীর আবার চাকরী গেছে। আপনার নির্দেশ না পেলে কী কারণে ব্যাংক লোন দিলোনা, সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবনা।

আর ক্যাটেনবার্গ

ম্যানেজিং সুপারভাইজার

সব রিপোর্ট তালাবদ্ধ সুটকেসে বেডরুম ক্লোজেটের ভেতরে রেখেছে হেলেন। কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস এই ষড়যন্ত্রের কিছু জানেনা। এবং প্রতিশোধের এই নাটকে ডেমেরিসের ভূমিকা আছে, ওকে কোনো কিছুই জানাবেনা হেলেন।

এইবার খেলা হবে শুরু।

খেলা শুরু হলো একটা ফোন কল দিয়ে। আর, এ, এফ-এর ভূতপূর্ব পাইলট, এখন কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিসের পাইলট আয়ানের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রাত তিনটায় বাড়ী ফিরে ল্যারী ক্যাথরিনকে বলে, 'ও চাকরী ছেড়ে অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যবসা করতে যাচ্ছে। ওর চাকরীটা আমি পাবো। আমরা গ্রামে যাবো।'

ল্যারী প্রথমে গেলো।

দশ দিন পরে ল্যারীর ফোন কল পেয়ে গ্রীসে যেতে হলো ক্যাথরিনকে।

তেরো

এথেন্স, ১৯৪৬। মানুষ কোনো কোনো শহরের রূপ বদলায়। কোনো কোনো শহর মানুষকে বদলায়। এথেন্স তেমনি এক শহর। শতাব্দীর পর শতাব্দী হাতুড়ির ঘায়ে সে ভাঙেনি। সারাসেন, ইংরাজ, তুর্কীদের আক্রমণ সত্ত্বেও সে টিকে আছে। অ্যাটিকার কেন্দ্রীয় সমতল ভূমি দক্ষিণ পশ্চিম ঢালু হয়ে মিশেছে সারনিক উপসাগরে, পূর্বদিকে মাউন্ট হাইমেটাস। প্রাচীন স্মৃতির প্রেতচ্ছায়া, প্রাচীন গৌরবের ঐতিহ্য। নাগরিকরা যেমন বর্তমানকে চেনে, তেমনি অতীতকে। চিরন্তন বিস্ময় ও উদ্ভাবনার রহস্যময় নগরী এথেন্স।

কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস ল্যারীকে তিন ঘণ্টা বসিয়ে রেখে তারপর দেখা করেছিলো। বসার ঘরের দেওয়ালে সোনালী, সবুজ, নীল রং, দামী পর্দা, রোজউডের প্যানেল, মেঝেতে দামী কারপেট, মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠনের আলো। জাঁ অনর ফ্রাগোনরদের পেন্টিং, শ্বেতপাথরের ম্যানটেলপিসে ফিলিপ কাফিয়েরির তৈরী ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু। খোলা জানলার বাইরে পার্ক সেখানে স্ট্যাচু ও ফোয়ারা। দেয়ালে প্রকাণ্ড ম্যাপের নানা জায়গায় পিন। সেদিকে তাকায় ল্যারী। ডেমেরিস বললো, 'তুমি ও আয়ান হোয়াইস্টোন দুজনেই আর, এ, এফ-এর পাইলট ছিলে, তাই না? হোয়াইস্টোনের মতে, তুমি ভালো পাইলট। যারা কাজ জানে, আমি তাদের পছন্দ করি। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই নিজের কাজ ঠিকমত বোঝেনা, জানেনা। যে কাজ তাদের অপছন্দ, সেই কাজেই বন্দী হয়ে থাকে। যে মানুষ তার কাজকে ভালোবাসে, সে জীবনে সফল হয়।'

'হয়তো তাই।'

'কিন্তু মিস্টার ডগলাস, তুমি সফল নও। যুদ্ধে সফল হয়েছিলে। শান্তির সময় ব্যর্থ। প্যান আমেরিকান তোমায় বরখাস্ত করলো কেন?'

'ওখানে পনেরো বছর পরে পাইলট হতাম।'

'তাই তুমি চীফ পাইলটকে মারলে?···তারপর আর দুটো চাকরী তোমার গেছে। রেকর্ড তোমার খুব খারাপ।'

'সেটা আমার দোষ নয়। আমি ভালো পাইলট।'

'তা আমি জানি। তুমি ডিসিপ্লিন মেনে চলোনা!'

'বোকারা অর্ডার দিলে আমি মানিনা।'

'আশা করি তুমি আমায় বোকা বলে মনে করবেনা।'

'প্লেন কিভাবে চালাতে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দিতে না এলে তা ভাববোনা।'

'না, প্লেন চালানো তোমার কাজ। তোমাকে দেখতে হবে, আমি যেন নিরাপদে এবং আরামে ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাই।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, মিস্টার ডেমেরিস।'

'আমারও তাই ধারণা। হকার সিডেলী প্লেন তুমি আগে ওড়াওনি?

'শিখে নেব। আপনি নতুন নতুন প্লেন কিনবেন। যে-কোনো প্লেন ওড়ানো শিখে নিতে পারে, এমন পাইলটই আপনার দরকার।'

'ঠিক বলেছো। আমি এমন একজন পাইলট খুঁজছি, যে প্লেন চালাতে ভালোবাসে।'

আয়ান হোয়াইটস্টোন হঠাৎ চাকরী ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় গেলো। একটু অবাক হয়েছিলো ডেমেরিস। কে যেন টাকা দিয়েছে আয়ানকে। ব্রিটিশ এয়ার মিনিস্ট্রী বলছে, ল্যারী ডগলাস ভালো পাইলট। তবু

কোথায় যেন একটা ঝামেলা। কিন্তু হেলেন বলছে· 'হোয়াইটস্টোনকে যেতে দাও· কোষ্টা। আমেরিকান পাইলট যখন এতোই ভালো, ওকে রেখেই দেখা যাকনা···'

সেই জন্যেই ল্যারীকে চাকরীটা দিয়েছে ডেমেরিস।

বছরের পর বছর সাবধানে প্ল্যান করে আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে ল্যারীকে শেষ অবধি ফাঁদে ফেলেছে হেলেন। ল্যারীর সঙ্গে কোনদিন দেখা না হলে ডেমেরিসের সঙ্গে সুখী হতে পারতো ও। দুজনের স্বভাবের অনেক মিল। দুজনেই ক্ষমতালোভী। ক্ষমতা কী করে ব্যবহার করতে হয়, দুজনেই জানে। তারা সাধারণ মানুষ নয়, দেবতার মতো, শাসন করা তাদের কাজ। এবং অদ্ভুত ধৈর্যশক্তি থাকায় তারা দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করতে পারে। হেলেনের প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে।

আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে ও। ল্যারী ডগলাসের জীবন আজ ছোট ছোট ব্যর্থতায় ভরা।

রিসেপশন হলে ঢুকলো হেলেন। ল্যারী আরো সুন্দর হয়েছে।

'হ্যালো আমি ল্যারী ডগলাস, মিষ্টার ডেমেরিসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে।' না ল্যারী তাকে চিনতে পারেনি। আশ্বস্ত হলো হেলেন

শহরের কোলোনাকি এলাকার চার ঘরের অ্যাপার্টমেণ্টে উঠেছে ক্যাথি। ল্যারী দিনে বাড়ি থাকেন। শুধু ডিনারের সময় আসে। ল্যারীর বন্ধু দীঘল চেহারার প্রৌঢ় কাউণ্ট জর্জ প্যাপপাসের সঙ্গে এথেন্সের প্রাচীনতম এলাকা 'প্লাকা'য় একদিন ডিনার খেতে গেলো ক্যাথি। অলিগলি, ভাঙাচোরা সিঁড়ি, ছোট ছোট বাড়ি, কফি রোষ্ট হওয়ার গন্ধ, ফুল-ফলের দোকান বেড়াল ও বাচ্চাদের ঝগড়া-চেঁচামেচি।

ট্যাভার্ণের ওয়েটাররা নানা রঙের পোষাক পরেছে। খাবারের অর্ডার দিয়েছে কাউণ্ট। আঙ্গুর পাতায়-মোড়া মাংসের নাম 'ডোলম্যাটেস'। মাংস ও বেগুনের সুস্বাদু পিঠের নাম 'মৌসাকা' পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধা খরগোসের মাংস 'ডিফাজো,' ক্যাভিয়ার জলপাই তেল ও পাতিলেবুর রসের স্যালাডের নাম 'টারামোসোলাটা'। গ্রীসের জাতীয়মদ 'রেৎসিনা' কিন্তু বাজে, পাইনের আঠার গন্ধে ভরা।

অলিমপিয়ায় প্রথম অলিম্পিক থেকে শুরু করে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও প্রত্যেক বছর হয়েছে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

বাড়ি ফিরে ক্যাথি ল্যারীকে বলে, 'আমি কাউণ্টের সঙ্গে বেড়াচ্ছি, তোমার হিংসে হয়না ?'

'কাউণ্ট কে ? ও হোমোসেকসুয়্যাল।' সোজা জবাব ল্যারীর।

থেসালীর সমভূমিতে কালো পোষাকপরা মেয়েরা কাঠের বস্তার ভারে ঝুঁকে পড়েছে দেখে ক্যাথি বলে, 'ভারী কাজ পুরুষেরা করেনা কেন ?'

'মেয়েরা তা চায়না। রাতে অন্য কাজে যেন ক্লান্তি না আসে পুরুষের

পারোস্ দ্বীপ। মাথায় খড়ের হ্যাট, ক্যাথরিন চলেছে খচ্চরের পিঠে। পাশে খচ্চরের পিঠে ল্যারী। সমতলের বুকে শত শত গাছে লক্ষ লক্ষ নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। গাইড বলে, 'এই হলো প্রজাপতি উপত্যকা।'

ক্যাথরিন বলে, 'প্রজাপতি কই ?'

গাইড হেসে গাছের মরা ডাল দিয়ে গাছের ডালে জোরে মারলো। শত শত 'ফুল' উড়ে গেল রামধনুর রং ছড়িয়ে। ফুল নয় প্রজাপতি।

ল্যারী ডগলাসের প্লেনে উঠেছে হেলেন। কটে স্তাজুর থেকে ডেমোরিসের প্রমোদপোতে যাবে প্লেন। ল্যারী বলে, 'গুড মর্ণিং মিস পেইস, আমি ল্যারী ডগলাস।'

কোনো জবাব দিলোনা হেলেন।

ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে আবহাওয়ার সামান্য গোলমাল হলেও সুন্দরভাবে প্লেন নামালো ল্যারীর।

হেলেন পল মেকসাসকে বললো, 'তোমার নতুন কো-পাইলট এমেচার। ওকে প্লেন ওড়াতে শেখাও।' পরেরবার···

অসলো থেকে লণ্ডন। উত্তরে হাওয়ার চাপ, পূর্বে বজ্রবিদ্যুৎ। কৌশলে সুন্দরভাবে প্লেন নামিয়ে ল্যারী বললো, 'মিস পেইস, প্লেন ভালো নামলো তো?'

'পল মেটাকসাস তোমার কো-পাইলটকে বলো, 'ওর সঙ্গে আমি কথা বললে তবে যেন ও জবাব দেয়।'

'ইয়েস মাদাম।'

ডেমেরিস একদিন ল্যারীকে বললো, 'মিস পেইস তোমায় পছন্দ করছেন না। তোমার ব্যবহারে উনি বিরক্ত।'

'ভবিষ্যতে আমি সাবধান হবো, মিস্‌টার ডেমেরিস।'

কিন্তু সত্যিই তো হেলেন পেইসের সঙ্গে কোনো অভদ্রতা করেনি ল্যারী ডগলাস। অথচ তার চাকরীটা যেন খতম করতে চাইছে? ল্যারী বুঝতে পারে না।

···বেইরুটের সিনেমা হলে হেলেন পেইসের 'দ্য থার্ড ফেস,' সিনেমাটা দেখে মুগ্ধ ল্যারী বলে ফেলে 'থার্ড ফেস' দেখলাম। যতো অভিনেত্রী আমি দেখেছি, তাদের সঙ্গে আপনার তুলনা হয়না।'

'তুমি পাইলট হিসাবে বাজে। সমালোচক হিসেবে ভালো হতে হলে যে বুদ্ধি বা রুচির দরকার তাও তোমার নেই!'

ল্যারীর প্লেনে প্যারীর দোকানে যেয়ে পার্স, বেল্ট, সেন্ট, জুতো কিনলো হেলেন। ল্যারীকে প্যাকেট হাতে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে হেলেন রেস্তোরাঁয় ঢুকে গেলো। বৃষ্টির মধ্যে দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলো ল্যারী।

কোপেনহাগেন থেকে ফিরে একটা প্যাকেট কনস্ট্যান্টাইন ডেমেরিস-কে পৌঁছে দিতে এসেছে ল্যারী। সঙ্গে এসেছে ক্যাথি। একটা পেণ্টিং-এর সামনে একা দাঁড়িয়েছিলো ক্যাথি। পেছন থেকে ডেমেরিস বললো, 'মিসেস ডগলাস, মনেৎ এর আঁকা ছবি আপনার পছন্দ?'

লোকটার চেহারায় প্রায় ভয়ঙ্কর প্রাণশক্তির ছাপ। ক্যাথরিনের গ্রীস কেমন লাগছে। অ্যাপার্টমেণ্ট কেমন, ডেমেরিস জানতে চাইছে। এমনকি ক্যাথির যে মিনিয়েচার পাখির সংকলন আছে, তাও জানে ডেমেরিস।

পরের দিন সকালেই ডেমেরিসের কাছ থেকে উপহার পেলো ক্যাথি। চীনামাটির তৈরী ছোট্ট পাখি। রেসে ও ক্রিসমাস পার্টিতে ক্যাথির সঙ্গে দেখা হয়েছে ডেমেরিসের। খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছে ডেমেরিস। সত্যি আশ্চার্য মানুষ, ক্যাথি ভাবে।

আগষ্টে উৎসব শুরু হয়েছে এথেন্সে। নাটক, ব্যালে, অপেরা, কনসার্ট। আক্রোপোলিসের নিচে প্রাচীন মুক্তাঙ্গন মঞ্চে নাটক হচ্ছে। মিডিয়া নাটকের অভিনয় দেখে চাঁদনী রাতে খোলা আকাশের নীচে হাঁটছে কাউণ্ট ও ক্যাথি। কাউণ্ট বলে, 'সব সময় নতুন প্ল্যান করছে

ল্যারী। পলিমেক্যানস।' রাস্তা পার হবার সময় একটা গাড়ী বিপজ্জনক ভাবে ছুটে গেলো। কাউণ্ট বললো, 'মোটর গাড়ী চালানোর মানসিকতা এখনো আয়ত্ত হয়নি গ্রীকদের। আজো তারা গাধায় চড়ছে।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'না। গ্রীসকে চিনতে চাইলে প্রাচীন গ্রীসের ট্রাজেডী পড়ো ক্যাথরিন। আমরা আজও অতীত শতাব্দীর বুকে বেঁচে আছি মহৎ বাসনা, গভীর আনন্দ নিয়ে। বড় সুখ,, বড় দুঃখ। দূরের তারার দিকে তাকালে লোকে যেমন আসলে নক্ষত্র না দেখে অতীতের ছায়া দেখে, বাইরের লোক গ্রীসের মানুষের দিকে তাকালে তার সত্যিকারের অস্তিত্বের কাছে আসতে পারেনা।'

ট্র্যাভার্ণের জানলায় সাইনবোর্ড, 'মাদাম পিরিস। ভাগ্য বলে দেন।'

কাউণ্ট বলে, 'তুমি ডাইনি দেখেছো? মাদাম পিরিস ডাইনী। সে অতীত ও ভবিষ্যত বলতে পারে। এথেন্সের চীফ অফ পুলিশ সফোক্লিস ভ্যাসিলী আমার বন্ধু ছিলো। ঘুষ নিতো না, সৎ ছিলো। এক অসৎ ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী একে খতম করতে চাইলো। আমি ওকে বললাম, মাদাম পিরিসের সঙ্গে দেখা করো। মাদাম পিরিস বললো— অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু হবে পুলিশ চীফের, ভরদুপুরে সে সিংহের শিকার হবে। এথেন্সে কোনো বন্যজন্তু সম্প্রতি আনা হয়নি। চিড়িয়াখানায় সিংহেরা খাঁচায় বন্ধ আছে। তারপর শনিবার দুপুর বারোটায় ওর ছেলের জন্মদিনে নৌকায় পারি দেবো প্ল্যান করে ওর অফিসে গেলাম।...দেখলাম, অফিসে ভ্যাসিলী নেই।...ছেলের জন্মদিনে অনেক উপহার এসেছিলো। তার মধ্যে একটা খেলনা সিংহ—ভেতরে ছিলো টাইমবোমা।'

এথেন্স, ১৯৪৬। চাকরীটা খুবই পছন্দ ল্যারীর। বাড়ি ফিরলে ক্যাথি। অন্য কোথাও গেলে যায় হোটেলের ঘরে হেলেনার কাছে। এয়ারহোস্টেস হেলেনার সুন্দর যৌবন। হেলেনা সুন্দরী, চোখ কালো। যার যৌনকামনা কিছুতেই মেটেনা। সব ভালো। শুধু ঝামেলা বাধাচ্ছে ডেমেরিসের রক্ষিতা ওই কুত্তিটা। যার নাম হেলেন পেইস।

হেলেন আমস্টারডামে যাবে। অথচ ওখানে ভয়ঙ্কর কুয়াশা। কিছু দেখা যাচ্ছেনা, প্লেন নামানো যাবেনা। সব ফোনে জানানো সত্ত্বেও দুটোর সময় এয়ারপোর্টে এলো হেলেন। ল্যারী ভাবছে, পাহার চুড়োয় প্লেন ধাক্কা খেলে মেয়েটা মরবে, সেটা ভালই হবে। কিন্তু এই নির্বোধ কুত্তিটার জন্যে নিজে মরতে রাজি নয় ল্যারী। ডেমেরিসকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছেনা।

'মিস পেইস ফ্লাইট ক্যানসেল্ড। আমস্টারডামের এয়ারপোর্ট কুয়াশায় ঢাকা।'

'প্লেনে অটোমেটিক ল্যানডিং একুইপমেণ্ট আছে। মিস্টার ডেমেরিস একটা কাপুরুষকে পাইলট করেছেন কেন? আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলবো।'

মেটাকসাস হতভম্ব। 'ল্যারী, আমরা যাবো।'

'চলো।'

নিচে বরফঢাকা সুইজারল্যাণ্ড। জার্মানীতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা নামে। আমস্টারডামের রেডিও রিপোর্ট, উত্তর সমুদ্র থেকে উড়ে আসছে ঘন কুয়াশা। মেটাকসাস বলছে, 'ডবল লাইফ ইন্সিওরেন্স করা করা উচিত ছিলো আমার। দুটো পাগলের সঙ্গে প্লেনে চড়েছি।'

আমষ্টারডাম টাওয়ার জানালো, 'এয়ারফিল্ড কুয়াশা ঢাকা। কলোনে ফিরে যাও।'

ল্যারী বেতারে জানায়, 'এমার্জেন্সী গ্যাস নেই।'

খানিকক্ষণ পরে টাওয়ার বলে, 'এমার্জেন্সী ক্লীয়ারেন্স।'

'পল, গ্যাস ফেলে দাও। ট্যাংকভর্তি গ্যাস নিয়ে নামলে দুজনেরই লাইসেন্স যাবে।'

তুলোর মতো সাদা, ঘন কুয়াশার আড়ালে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। 'তোমরা মাটি থেকে দুশো ফুট উঁচুতে···পাঁচশো...চারশো..ষাট··· চল্লিশ,-টাওয়ার বেতারে জানাচ্ছে। অথচ কিছু দেখা যাচ্ছেনা। শেষে ল্যারী যখন প্লেন ওপরে তোলার ধান্দা করছে, তখন দেখা গেলো রান-ওয়ের আলো। প্লেন নেমে এলো। ল্যারী নিশ্চল, তার পা কাঁপছে। কো-পাইলট মেটাকসাস বলে, 'আমি প্যাণ্টে পেচ্ছাব করে ফেলেছি।'

নিশ্চিন্তে ক্যানটিনে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে হেলেন। 'আমস্টারডাম,' ল্যারী বলে।

আমস্টেল হোটেলে উঠলো হেলেন। ল্যারীর জন্য বরাদ্দ বিচ্ছিরি ঘর রান্নাঘরের পাশে। বেলবয় বলে, 'মাদাম সবচেয়ে সস্তা ঘরটা তোমায় দিতে বলেছেন।'

ডেমেরিসের কোন বন্ধুর প্লেনে পাইলটের চাকরী পাওয়া যায়না? ল্যারী ভাবছে, না, ডেমেরিস তাকে বরখাস্ত করলে আর কেউ চাকরী দেবেনা। বারে ড্রাই মার্টিনি চাখতে চাখতে তার মনে পড়ে, ঠিক রাত দশটায় ডাকতে বলেছিলো হেলেন পেইস। সর্বনাশ, পনেরো মিনিট দেরী হয়ে গেছে। করিডর থেকে ছুটে গেলো ল্যারী। দরজায় ধাক্কা দিতে কেউ সাড়া দিলোনা। নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ল্যারী।

'মিস পেইস?' বাথরুমের দরজা খুললো। মাথায় চুলে টারকিশ তোয়ালেটা বাঁধা, বাকি শরীর উদোম।

'তোয়ালেটা দাও।' যেন ল্যারী পুরুষ নয়, খোজা কিম্বা মেয়ে-মানুষ। সস্তা প্রতিশোধের জন্য অনেক কিছু হারাতে যাচ্ছে বুঝেও হেলেনের দিকে হাত বাড়ালো ল্যারী।

চৌদ্দ

এথেন্স, ১৯৪৬। সময় এখন ক্যাথরিনের শত্রু। ল্যারী তাকে ভালোবাসেনা। ল্যারীর ভালোবাসা মরে গেছে। সময়ের অন্তহীন করিডরে কোথায় মিলিয়ে গেছে সেই প্রেম। শুধু প্রতিধ্বনি জেগে আছে। কনস্ট্যানটাইন তিন সপ্তাহের জন্যে ল্যারীর প্লেনে আফ্রিকা গিয়েছিলো। তিন সপ্তাহ পরে ফিরেও ক্যাথির সঙ্গে কথা বলার কোনো আগ্রহ নেই ল্যারীর। ট্যাক্সিতে হেলেনার সঙ্গে ল্যারীকে দেখেছে ক্যাথি। ল্যারী অজুহাত দিয়েছে, ডেমেরিসের হুকুমে হেলেনাকে ক্রিটে নিয়ে যাচ্ছিলো ল্যারী।

সময় আজ ল্যারীর বন্ধু। আমস্টারডামের সেই রাতের পর তার জীবন বদলে গেছে। 'তুমি আমার, শুধু আমার,' হেলেন বলেছে। এয়ারহোস্টেস হেলেনার অ্যাপার্টমেন্টে পরে যেয়ে ল্যারী দেখে, হেলেনা উদম উলঙ্গ, মুখে বুকে ক্ষতচিহ্ন, সামনের তিনটে দাঁত ভাঙা। দুটো লোক ওকে মেরে, ধর্ষণ করে কোথায় চলে গেছে। ডাক্তারকে ফোন করে ল্যারী। আধঘণ্টা পরেই ফ্লাইট। দুদিন পরে ফিরে এসে সে দেখে,

হেলেনা নেই। হেলেনের সঙ্গে দেহ মিলনের সময় ও বলে, 'আর কখনো অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়োনা, তাহলে সেই মেয়েকে এবার আমি খুন করবো।'

'তুমি আমার, শুধু আমার।'—কথাটার ভয়ংকর অর্থ এবার বুঝতে পারে ল্যারী।

এথেন্সের একশো মাইল উত্তরে সমুদ্রের ধারে ছোট্ট গ্রাম রাফিনায় পাথরের দেয়ালঘেরা ভিলা। হেলেন রান্না করছে, ল্যারীর সঙ্গে সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, রাতে বিছানায় ওকে অদ্ভুত আনন্দ দিচ্ছে। ওদিকে পোকার ও জিন রামি খেলে হারছে ল্যারী। একদিন ওরা সমুদ্রসৈকতে রোদে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে। হঠাৎ দূরে দুজন লোককে দেখে হেলেন বলে, 'ল্যারী, ভেতরে চলো।'

ঘরে ফিরে ল্যারী বলে, 'এভাবে অপরাধীর মতো লুকিয়ে তোমার সঙ্গে মেশা আমার পছন্দ নয়। আমি তোমায় ভালোবাসি।'

এবং হেলেন জানে, ল্যারী সত্যি কথা বলছে।

'ল্যারী, তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও?'

'চাই। কিন্তু তুমি তো বলছো, ডেমেরিস জানলে সর্বনাশ হবে।'

'ঠিকমত প্ল্যান করলে কিছুই হবেনা। ডেমেরিস আমার মালিক নয়। আমি তাকে ছেড়ে দেবো। দুমাস পরে তুমি চাকরী ছাড়বে। তুমি যাবে আমেরিকায়। সেখানে আমাদের বিয়ে হবে। আমার যা টাকা আছে, তুমি নিজস্ব প্লেন, নিজস্ব এয়ার লাইন কিনতে পারবে।'

'আমার স্ত্রীর কী হবে?'

'ডিভোর্স করো।'

'যদি রাজি না হয়…'

'অনুরোধ করোনা, শুধু বলে দিও।'

এখন কাউণ্টের সঙ্গেও দেখা করেনা ক্যাথি। সারাটা দিন শুধু মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে ক্যাথি। মদ যন্ত্রণা কমায়, চিন্তা থেকে বাঁচায়। উইলিয়াম ফ্রেজার আমেরিকা থেকে এথেন্স এসে স্থাখে, বেলা এগারোটার সময় ব্র্যাণ্ডির গ্লাস হাতে টলছে ক্যাথরিন।

'ক্যাথি, তুমি মদ খাও, ল্যারী জানে?'

আয়নায় নিজেকে দেখে ক্যাথি। রন পিটারসন, বিল ফ্রেজার এবং ল্যারী ডগলাস বলেছিলো, তুমি সুন্দরী। এই সুন্দর? ফুলে ওঠা মুখ চোখের কোণে কালি, বিশ্রী মোটা।

ডাক্তার নিকোডেস বুড়ো, চোখে করুণার ছাপ, মাথার চুল সাদা কেশরের মতো। সে বলে, 'মিসেস ডগলাস, মদ ছাড়তে হবে, খাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ মানতে হবে। ব্যায়াম, ফিজিওথেরাপীতে কয়েক মাস লাগবে। হয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আয়নায় নিজেকে দেখে তোমার ভালো লাগবে, তোমার স্বামীরও তোমাকে ভালো লাগবে।'

তাই হবে। ক্যাথরিনকে এতো বিশ্রী দেখালে ল্যারী তাকে ভালো-বাসবে কেন? বিউটি পারলরের কথাও বলেছিলো ডাক্তার। আগামী কাল সকালের জন্য অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে ক্যাথি দেখে ট্যাভার্ণের জানালায় সাইনবোর্ড—'মাদাম পিরিস, ভাগ্য বলে দেন।' ভেতরে ঢোকে ক্যাথি। মাদাম খুব বুড়ো, খুব রোগা, পরণে কালো পোষাক ভাঙাচোরা মুখ। ওয়েটার ক্যাথির সামনে কালো কফির কাপ রাখে। 'খাও।' বুড়ী মাদাম বলে। ওর কফি খাওয়া শেষ

হলে কফির তলানির দিকে তাকিয়ে বুড়ী বলে, 'তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো।'

'ওটা সবাই বলতে পারে।'

'ঘরে ফিরে যাও।'

'আমেরিকায় ?'

'যেখানে হোক। ও তোমার চারপাশে।'

'কে ?'

'গেট আউট।' যেন এক জন্তুর যন্ত্রণাবিদ্ধ চিৎকার।

'আমি ভয় পাচ্ছি। কী হবে ?'

'মৃত্যু তোমার কাছে আসছে।' বুড়ী উঠে পেছনের ঘরে চলে গেল।

'ঘরে ফিরে ক্যাথি দেখে, ল্যারী স্যুটকেসে সব গুছোচ্ছে।

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'ল্যারী, আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। সব দোষ আমার। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবো। আমায় আর একটা সুযোগ দাও।'

'না, ক্যাথি সব শেষ। আমি আর একটি মেয়েকে ভালোবাসি। আমি ডিভোর্স চাই। আমার অ্যাটর্ণী তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

ল্যারী চলে যেতে বাথরুমে ঢুকলো ক্যাথি। ব্লেড বার করে হাতের শিরা কাটলো।

ইভ্যানজেলিনস হসপিটালে জ্ঞান ফিরে ক্যাথি দেখলো, তার সামনে ডক্টর নিকোডেস, সাদা ইউনিফর্মপরা নার্স ও বিল ফ্রেজার।

'ফোন করে সারা না পেয়ে তোমার ফ্ল্যাটে যেয়ে দেখি...'

'স্যরি বিল'। আমি বোকার মতো...,

'সকালের প্লেনে দেশে ফিরতে হবে। আমি যোগাযোগ রাখবো।'

তারপর ল্যারী আসে। বলে, 'ক্যাথি, আমি তোমার মৃত্যু চাইনা। শুধু ডিভোর্স চাই।'

'না, ল্যারী, তুমি আমার স্বামী। আমি যতোদিন বাঁচবো তুমি আমারই স্বামী থাকবে।'

সমুদ্রসৈকতে তোয়ালে বিছিয়ে শোয় হেলেন ও ল্যারী। হেলেন বলে' 'তাহলে তুমি খুন করবে ক্যাথিকে। কেননা বেঁচে থাকার যোগ্যতা নেই ক্যাথির। যাকে ধরতে চাইলে ধরা দেবেনা তাকে ছেড়ে দিতে চাইছেনা ক্যাথি। এইভাবে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। এইভাবে সে আমাদের জীবন নষ্ট করতে চায়। ও বাঁচতেও চায় না। ও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো।'

'হেলেন আমি পারবোনা। সবাই জানে, আমার ও ক্যাথির দাম্পত্য জীবন সুখের নয়, এখন ক্যাথি মরলে সবাই আমায় সন্দেহ করবে।'

'ইওয়ান্‌নিনা দ্বীপে একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হবে.

ডেমেরিসের ভিলার হলঘরে পল মেটাকসাস।

'স্যার, ল্যারী ডগলাস...রাফিয়ানার সমুদ্রের ধারে ভিলার মিস হেলেন পেইসের সঙ্গে...আমার বোন ওখানকার ভিলার হাউসকিপার।'

'ওসব মিস পেইসের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ তার ওপর নজর রাখুক সে চাইবেনা। তুমি যেতে পারো।'

পরের দিন সকালে মেটাকসাস ফোনে অর্ডার পেলো, তাকে ডেমেরিসের কঙ্গোর মাইনিং কোম্পানীতে প্লেনে ব্রাজাভিল থেকে যন্ত্রপাতি পৌঁছে দেবার ভার দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ফ্লাইটে বুধবার সকালে

প্লেনটা ভেঙে পড়লো ঘন অরণ্যের গভীরে। পলের ছেঁড়াখোঁড়া বা বিধ্বস্ত প্লেন কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এখন ক্যাথির সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো হয়েছে ল্যারীর। 'আমি তোমাকেই ভালোবাসি ক্যাথি। আর কাউকে নয়। আর একটা সুযোগ দাও আমায়।'

তারপর নগ্ন শরীর তপ্ত শরীরে মিশে যায়। যেন প্রথম মধুরজনীর মিলন। ক্যাথির শরীরের গভীরে কতোদিন জমেছিলো অতৃপ্ত এই কামনা বাসনা?

'আমরা দ্বিতীয় হনিমুনে যাবো। ইওয়াননিনা দ্বীপে…'

একদিকে সমুদ্র, আর একদিকে পাতিলেবু, কমলালেবুর, আপেল ও চেরীর অজস্র গাছ। ফারমহাউসের জানালা ও ছাদ নীল। রিও নদীর ওপারে ইওয়াননিনা। হোটেলের ইউনিফর্মপরা বুড়ো কর্মচারী বলে, হনিমুনে এসেছেন তো? দেখেই বোঝা যায়।'

ক্যাথরিন মা হতে চাইলে রাজি হয়নি ল্যারী। ক্যাথি ভাবছে এখন যদি আবার কথাটা বলা যায়?

জঙ্গলের মধ্যে এক অদ্ভুত একটা স্বর্গের মতো বাড়ী দেখে ভেতরে ঢোকে ল্যারী ও ক্যাথি। কালো পোষাকপরা খৃস্টান ধর্মযাজিকা কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভেতরে চলে যায়।

আর একজন ধর্মজাজিকা এসে বলে, 'আমি সিস্টার তেরেসা। কারমেলাইট অর্ডারের নানদের কথা বলা বারণ। প্রয়োজন হলে শুধু আমি কথা বলতে পারি। আমাদের জীবন এই চার দেয়ালের মধ্যে বদ্ধ।'

'আপনাদের ঝামেলা বাড়াবার জন্যে দুঃখিত।'

'ও কিছু না। ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকুন।'

হোটেলের জিমনাসিয়ামে ব্যায়াম করছে ক্যাথি, ম্যাসাজ করাচ্ছে। তার চেহারার পরিবর্তন ল্যারীরও চোখে লাগে। আজকাল হোটেলের ওয়েটার ঝি. বেলবয়ের সামনে বউকে আদর করে ল্যারী। সবাই দেখুক, বউকে সে কতো ভালোবাসে।

'ক্যাথি, আমরা মাউন্ট জুমেরকার চূড়ায় উঠবো।'

'ডার্লিং পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস নেই আমার।'

'একা যেতে আমার ভালো লাগেনা, ল্যারী বলে। শেষ অবধি পাহাড়ে চড়তে রাজি হলো ক্যাথি।'

দুটো রাস্তা শক্ত ও শুরু রাস্তাটা বেছে নিলো ল্যারী। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্যাথির। দড়ি ধরে কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে খাদ পার হতে হয়। আস্তে আস্তে পার হতে হতে ক্যাথির বুকে আতংক জাগে। পাথরের বুকে শ্যাওলা, আগাছা। সরু খাড়া রাস্তা। মাঝে মাঝে বাঁকা। কোনো রকমে পাহাড় চুড়োয় উঠলো ক্যাথি। সাদা মেঘ ভেসে আসছে। মেঘের মধ্যে ঢাকা পড়েছে ক্যাথি।

ল্যারী উঠে দাঁড়ায়। সে ক্যাথির দিকে হেঁটে যায়। ক্যাথি পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাথির দিকে দুহাত বাড়ালো ল্যারী !!!

হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো, 'ডেনভারে এর চেয়ে উঁচু পাহাড় আছে।'

আতংকিত ল্যারী ঘুরে দাঁড়ালো। সহজ চওড়া রাস্তা দিয়ে গ্রীক গাইডের সঙ্গে চুড়োয় উঠেছে কয়েকজন আমেরিকান ট্যুরিষ্ট।

'গুড মর্ণিং, আপনারা পূর্বদিক দিয়ে উঠেছেন? ও রাস্তাটা বিপজ্জনক।'

'পরের বার মনে রাখবো।'

'পেরামার গুহা দেখতে যাবো আমরা। হনিমুনে এসে সবাই যায়, ভেতরে যেয়ে কেউ কোনো ইচ্ছে জানালে তা নাকি পূরণ হয়। তোমার খুব ভালো লাগবে, ক্যাথি। লাঞ্চের পর আমরা যাবো।'

স্বামীকে বাচ্চা ছেলের মতো উদগ্রীব দেখে ক্যাথরিন ইতস্তত ভাব কাটিয়ে উঠে বলে, 'তোমার যখন পছন্দ, নিশ্চয়ই যাবো।'

তার আগে···শহরের ছোট্ট দোকান থেকে পকেট টর্চ, নতুন ব্যাটারী ও সুতোর একটা বল কিনলো ল্যারী। আবহাওয়া ভালো নয়, ঝড়ের আশংকা আছে।

বিকেল চারটায় পেরামার গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হলো ল্যারী ও ক্যাথি। জোড়ে হাওয়া দিচ্ছে। উপরের আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ। সূর্য্য তখন মেঘে ঢাকা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চুণাপাথরের গুহার ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা চূণ মেঝেয় পড়ে ছাদ অবধি উঠে প্রাসাদ এবং নানান আকর্ষণীয় আকার ধারণ করেছে। এই জায়গাটা ভ্রমণ পিয়াসীদের কাছে এক বিরাট আকর্ষণ।

সন্ধ্যা ছটার সময় গুহা বন্ধ হয়। একঘণ্টা আগে এসেছে ল্যারী ও ক্যাথি। দুটো টিকিট ও একটা প্যাম্পটলট কিনলো ল্যারী। কিন্তু সস্তা পোষাকপরা গাইড সামান্য পয়সার বিনিময়ে গুহা দেখতে চাইলে চটে উঠলো ল্যারী। 'না, আমাদের গাইডের দরকার নেই।'

ক্যাথি অবাক হয়ে বলে, 'গাইট নিলেনা কেন?'

'ফালতু পয়সা নষ্ট। প্যাম্পলেটে সব লেখা আছে।'

গুহার মুখের দিকে ফ্লাডলাইটের আলো, অজস্র ট্যুরিস্ট, ছাদে ও দেয়ালে নানা মূর্তি, পাখি, দৈত্য, ফুল, রাজমুকুট, প্রভৃতি খোদিত চিত্রশোভা।

'ফ্যানটাসটিক,' ক্যাথি বলে, 'কতোদিনের পুরানো কে জানে।'

পাথরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে গলার স্বর। প্রতিধ্বনি জাগে।

একটা মূর্তি খুঁটিয়ে দেখছিলো ক্যাথি। সেই অবকাশে ল্যারী দেখলো, একেবারে শেষ প্রান্তে ছাপা অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড—'বিপদ! ওদিকে যাওয়া নিষেধ।' নিমেষের মধ্যে সাইনবোর্ড এক-পাশে সরিয়ে দিয়ে ল্যারী ফিরে এলো, বললো, 'ক্যাথি, হোটেলের ক্লার্ক বলছিলো, সবচেয়ে মজার জিনিস দেখা যাবে ওই দিকে···এখানটা সস্তা খোঁড়া···'

'ওখানে তো বড্ড অন্ধকার।'

'আমি টর্চ এনেছি।'

'ওখানে···কোনো বিপদ হবেনা তো?

'না, স্কুলের ছেলেরাও এখানে আসে। এখানে অন্য কোনো ট্যুরিস্ট নেই।' অন্ধকার টানেল গোলকধাঁধার মতো। একবার বাঁদিকে ঘুরছে টানেল। টর্চের আলোয় ক্যাথি লহমার জন্যে দেখে, ল্যারীর মুখে অদ্ভুত উত্তেজনা। পাহাড়ের ওপর যেমন দেখাচ্ছিলো ল্যারীকে। ওর হাত চেপে ধরে ক্যাথি।

টানেল দু'ভাগ হলো। নিচু ছাদ। গোলক ধাঁধা। গ্রীক পুরাণের রাজপুত্র থিসিয়স ও নরপশু দৈত্য মিনোটাওরের কাহিনী মনে পড়ে যায়

ক্যাথির। এমনি এক গোলকধাঁধায় থাকতো মিনোটর। থিসিয়স গোলকধাঁধার পথ হারাবেনা বলে তার প্রেয়সী একটা সুতোর বল থেকে সুতো ছাড়ছিলো, অন্য প্রান্তটা ছিলো থিসিয়সের হাতে। থিসিয়স মিনোটারকে হত্যা করছিলো। ক্যাথি ভাবছে, এ গুহায় আমরা কী থিসিয়স ও মিনোটারের দেখা পাবো ?

'ল্যারী ডারলিং ফিরে গেলে হয়না ? গুহা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'রাত নটা অবধি খোলা। একটা গুহা নতুন খোঁড়া হয়েছে। সেটাই খুঁজছি।'

ল্যারীর পকেট থেকে কী যেন মেঝেয় পড়লো।

'কিছু না, পাথরে হোঁচট খেয়েছি।' ছাদ আরো নিচু। হাওয়ায় আরো আর্দ্রতা। অন্তহীন গোলকধাঁথা। সরু রাস্তা। আবার রাস্তাটা দুভাগ হয়। ডাইনে, বাঁয়ে। হঠাৎ ল্যারী থামে, 'ড্যাম, ভুল দিকে এসেছি।'

'ফিরে যাওয়া যাক।'

'এখানে দাঁড়াও। আমি কয়েক ফুট পিছিয়ে রাস্তাটা দেখে আসি। রাস্তা যেখানে দু'ভাগ হয়েছিলো, সেখান অবধি যায়। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরছি।'

'ঠিক আছে।'

আলো নেই, গাঢ় অন্ধকার। সেকেণ্ড গোণে ক্যাথি। সেকেণ্ডের পর মিনিট। ল্যারীর পাত্তা নেই। ক্যাথি চিৎকার করে ডাকে, ল্যারী! ল্যারী, তুমি কোথায় ? ফিরে এসো ল্যারী!' তবুও ল্যারী কোনো সাড়া দেয়না। আতংকে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ক্যাথির। হঠাৎ হুস্ করে একটা আওয়াজ। হাওয়ার ঝড় তুলে কী যেন ছুটে আসছে তার দিকে।

ঠাণ্ডা চামড়ার ছোঁয়া লাগে তার গালে, ধারালো নখ তার চুলে, তার মুখে পাখনার উন্মাদ ঝাপট। অজ্ঞান হয়ে যায় ক্যাথি। জ্ঞান ফিরলে সে দেখে, সে পাথরের ওপর শুয়ে আছে। তার গালে গরম চটচটে কী যেন? ক্যাথি টের পায় তার গাল থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। গুহায় অনেক বাদুড়।

বাদুড়? ভ্যাম্পায়ার? রক্তচোষা বাদুড়ের গল্প মনে পড়ে যায় ক্যাথির। জুতোর এক পাটি উধাও। ড্রেস ছিঁড়ে গেছে। তাতে কী হয়েছে? ল্যারী তাকে ড্রেস কিনে দেবে। সাদা একটা ড্রেস, যেন চোখের সামনে ওটা সাদা কাফন হয়ে যায়। আতংক, দুঃস্বপ্ন। এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা। কতোক্ষণ আগে গুহায় ঢুকেছে তারা? কোথায় হারিয়ে গেলো ল্যারী? গুহা থেকে বেরোনোর উপায়? সাবধানে, টানেলের দেয়ালে হাত রেখে দেওয়াল ধরে ধরে এসেছে ক্যাথি। চীনারা বুদ্ধিমান, ওরা বাজি অবিশ্যি করেছে, ওরা কখনো মাটির নিচে অন্ধকার গোলধাঁধায় বাঁধা পড়েনা। আমায় হেঁটে যেতে হবে। ল্যারী হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে।

হঠাৎ দূরে ডানার ঝাপটা। ভৌতিক ট্রেনের মতো কী যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। শত শত বাদুড়, ঠাণ্ডা ডানার ঝাপট, আতংক। জ্ঞান ফেরার আগে ল্যারীর নাম ধরে ডেকেছিলো ক্যাথি।

অকস্মাৎ ক্যাথির অচেতন মনে একটা ভাবনা জেগে ওঠে। ল্যারী আমায় খুন করতে চায়? ল্যারী বলেছে আমি তোমাকে আর ভালোবাসিনা, আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি, আমি ডিভোর্স চাই…এবং পাহাড় চুড়োয় মেঘের মধ্যে তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে হাত বাড়িয়েছিলো এবং বলেছিলো: না আমাদের গাইডের দরকার নেই। …তারপর ভয়াল অন্ধকার।

না, ল্যারীর মন বদলায়নি। সব অভিনয়। ক্যাথিকে খুন করার এটা একটা প্ল্যান মাত্র। ল্যারীর প্ল্যান সফল হলে এই গুহার গোলকধাঁধা থেকে কোনোদিন বের হতে পারবেনা ক্যাথি। আতংকের এই অন্ধকার সমাধিতে তার জীবন্ত কবর হবে। এখন সেই বাদুড়গুলো নেই। শুধু তাদের নোংরা গন্ধ ক্যাথির মুখ ও শরীরে। আবার ওরা আসবে।

তারপর···হঠাৎ ভেসে আসে অদ্ভুত একটা শব্দ। কাছে আসছে শব্দ। অন্ধকার টানেলে কে যেন তাকে ডাকছে। কে যেন আলো জেলেছে। কে যেন তার হাত ধরে তাকে তুলছে। ওদের বাদুড় সম্বন্ধে সাবধান করে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ক্যাথরিন।

পনেরো

এথেন্স, ১৯৪৬। 'ক্যাথরিন।' ল্যারী ডাকে।

'আমায় ছুঁয়োনা,' চিৎকার করে ওঠে ক্যাথি।

বেঁটেখাটো মোটা এক ভদ্রলোক হেসে বলেন, 'আপনি বরং একটু পাশের ঘরে যান। মিসেস ডগলাস, আমি ডক্টর কাজো মিডেস। এই নিয়ে এই গুহায় তিনবার অ্যাকসিডেন্ট হলো।'

'আমার স্বামী আমায় খুন করতে চেয়েছিলো।'

'না, ওটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমি তোমায় ঘুমের ইনজেকশন দেবো এখন। একটু ঘুমুলে তোমার ভালো লাগবে।'

'না !!! তুমি বুঝছোনা। আর কোনোদিন জাগবোনা। ও আমায় খুন করবে। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকবো ও আমায় খুন করবে।'

তবুও ইনজেকশন দিলো ডাক্তার, বললো, 'গুহার ভেতরে রাস্তা হারিয়ে ফেলে তোমার স্বামী। তারপর গুহামুখে এসে সে চেঁচামেচি করে, পুলিশ ডাকে। সার্চপার্টি তোমায় উদ্ধার করে।'

'ল্যারী পুলিশ ডেকেছিলো?'

'হ্যাঁ, বলছিলো, সব ওর দোষ।···এখন ঘুমোও। সকালে আসবো।'

কী আশ্চর্য, সে কিনা ভাবছিলো, ল্যারী তাকে খুন করতে চাইছে। সকালে সে ল্যারীর কাছে ক্ষমা চাইবে। সব ঠিক হয়ে যাবে···

জানলার কাঁচে বৃষ্টির শব্দ। বজ্রবিদ্যুৎ। ক্যাথির ঘুম ভাঙে। সাবধানে উঠে দাঁড়ালেও তার মাথা ঘোরে। ল্যারী কোথায়?

রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। একটা মেয়ে ল্যারীকে বলছে, 'দেখতে এলাম, কাজটা···'

'সব গোলমাল হয়ে গেলো।'

'এখন ও ঘুমুচ্ছে। কাজটা এখন করো।'

তাহলে দুঃস্বপ্নটা সত্যি। ল্যারী সত্যিই ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবে বলে ক্যাথিকে খুন করতে চায়?

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে বের হয় ক্যাথি। প্রবল ঝড়, বৃষ্টি। কাদার মধ্যে খালি পায়ে ছুটছে ক্যাথি। তার শরীর ভিজে, পা কেটে গেছে সে খেয়ালও করেনা। যেন শিকারীর ভয়ে ছুটছে শিকার। পরণে শুধু একটা পতলা নাইট গাউন। আকাশে যেন বজ্রবিদ্যুতের নারকীয় উৎসব শুরু হয়ে গেছে। সামনে হ্রদ, জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আমি কার কাছে যাবো? কার কাছে? আমি কেন এখানে এলাম? আমি

বিল ফ্রেজারের কাছে যাবো? হ্রদের ওপারে ঐ যে হলুদ আলো, ওখানে আছে বিল। আমি তার কাছে যাবো। অনেকগুলো রো-বোট। প্রত্যেকটা নৌকো দড়িতে বাঁধা। একটা নৌকোয় উঠে দড়ি খুলে দেয় ক্যাথি।

স্রোতের টানে নৌকো ভেসে যায়। বিলের সঙ্গে নৌকোয় উঠেছিলো ক্যাথি, মনে পড়ে। কিন্তু কী করে দাঁড় বাইতে হয়? বিরাট ঢেউয়ে কাঁপছে নৌকো, ঘূর্ণিতে ঘুরছে। দাঁড় দুটো জলে পড়ে গেলো। নৌকো ছুটে চলেছে। নৌকোজলে ভরে উঠেছে। বিল বিয়ের পোষাক কিনে দিয়েছে। জলে ভিজে গেলে বড্ড রেগে যাবে বিল ফ্রেজার। হলুদ আলোটা দেখা যাচ্ছে না, বিলও আমায় চায়না। তীর অনেক দূরে। কানের কাছে হাওয়ার গর্জন। ছোট্ট মেয়ের মতো প্রার্থনা করছে ক্যাথি, 'এখন আমি ঘুমোবো···ঈশ্বর আমার আত্মাকে তাঁর কাছে রাখুন···যদি আমার মৃত্যু হয়, ঈশ্বর আমার আত্মাকে গ্রহণ করুন।'

অদ্ভুত একটা সুখ। যেন আজ তার ঘরে ফেরার দিন।

মস্ত একটা ঢেউয়ে উল্টে যাচ্ছে নৌকোটা। অতল হ্রদের গভীরে।

ষোল

এথেন্স, ১৯৪৭। এথেন্সের ইউনিভারসিটি ষ্ট্রীটের ওপর আরসাকিওন কোর্ট হাউসের ৩৩ নম্বর ঘরে দর্শকের ভীড় সামলাচ্ছে পুলিশ। একটা পাশ কালোবাজারে ৫০০ গ্রীক মুদ্রায় বিক্রি হচ্ছে। চীফ অফ পুলিশ জরজিয়স তার ফটো খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে বলে দারুণ খুশি।

পালিশ করা মেহগিনির পার্টিশনের আড়ালে উঁচু চেয়ারে তিন জন বিচারক। মাঝখানে প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কোর্ট। মাথার ওপর চৌকোণা বিবর্ণ আয়না। সাক্ষীদের স্ট্যাণ্ডের সামনে কাগজপত্র পড়ার জায়গায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সোনার মূর্তি। বাঁদিকে আসামীর কাঠগড়া। সামনের টেবিলের পেছনে বসবেন উকিলেরা। রয়টার, ইউনাইটেড প্রেস, ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ সারভিস, ফ্রেঞ্চ প্রেস এজেন্সী ও তাসের রিপোর্টাররা বসে আছে। দর্শকদের প্রথম সারিতে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ অভিনেতা এবং হেলেনের একদার প্রেমিক ফিলিপ সরেইল। সে প্রেসের কাছে বিবৃতি দেবেনা। ফটোগ্রাফার ফটো তুলতে এলে সে তার ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। তার এক সারি পেছনে আরমাঁদ বসেছে। তার কাছেই বসে আছে ফ্যাসিবিরোধী ফরাসী বিপ্লবীবাহিনীর প্রাক্তন নেতা ও বিখ্যাত সার্জন ডক্টর ইজরায়েল কাৎজ। দুটো সীট পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী উইলিয়ম ক্রেজার। পাশেই একটা সীট খালি। শোনা যাচ্ছে, ওটা রিজার্ভ করা হয়েছে গ্রীক কোটিপতি কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিসের জন্য। আসামীর কাঠগড়ায় বসে আছে হেলেন। আমেরিকান সংবাদপত্রের ভাষায়, 'যেন এক অতিমানবী, যেন সোনার সিংহাসনে বসা এক দেবী। এবং যেহেতু সে জনতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে, জনতা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। সহানুভূতি নয়, সততাও নয়, শুধু কী হয়, তার প্রতীক্ষা।' কাঠগড়ার অন্য প্রান্তে বসে আছে কর্নেল ল্যারী ডগলাস। মনের ভেতরে রাগ। কিন্তু, এতো সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে যে, অনেক মেয়েই তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

নাটকের তৃতীয় তারকা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিমিনাল লইয়ার নেপোলিয়ঁ শ্যটাস। নেপোলিয়ঁ এখন ভাবছে, প্রথম দেখায় সে হেলেন পেইসকে

ভালোবেসে ফেলেছে। কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিসের অনুরোধে সে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলো। না, নার্ভাস বা আতংকিত নয় হেলেন। এই রকম একটা মেয়ের পক্ষে ডেমেরিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু ল্যারী ডগলাসের মতো একটা অপদার্থকে কেন ভালোবাসে হেলেন।

ভালোবাসা? নির্বোধ রুগ্ন রূপসীদের কেন বিয়ে করে বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী? নির্বোধ অভিনেত্রীকে কেন বিয়ে করে মহান লেখক? বেশ্যাকে কেন বিয়ে করে বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ? কে বলতে পারে।

ডেমেরিস বলেছে, 'জীবনে হেলেন ছাড়া কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি। এই কেস আপনাকে নিতে হবে। অবিস্বাস্য অংকের ফী দিয়েছে ডেমেরিস। এখন থেকে কনস্ট্যানটাইনের বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের আইনগত সবকিছু দেখাশোনা করবে নেপোলিয়ঁ। তার মানে, কোটি কোটি ডলার আয়। ডেমেরিস বলেছে, 'কিভাবে তুমি কাজটা করবে, আমি জানিনা। তবে কোনো ভুল যেন না হয়, তোমায় দেখতে হবে

তিন মাস আগে জেলে হেলেনের সঙ্গে দেখা করেছিলো কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস। তার চোখে নরকের যন্ত্রণা, তার সেই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে। যেন সব আলো নিভে গেছে।

'আমি দুঃখিত, কোস্টা।'

'আমি তোমায় খুন করতে চেয়েছিলাম।...কিন্তু তার আগে, তুমি আমায় খুন করেছ। আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি। আমি তোমায় ফিরে পেতে চাই। ছাড়া পেলে তুমি আমার কাছে থাকবেতো?'

ডেমেরিসের কাছে থাকা। তার মানে, ল্যারীকে আর কোনোদিন দেখতে পাবেনা হেলেন। কিন্তু, জীবন প্রেমের চেয়ে বড়।

'হ্যাঁ, কোস্টা।'

'ধন্যবাদ। অতীতকে আমরা ভুলে যাবো। তোমার পক্ষে আদালতে সমর্থণ করবেন নেপোলিয়ঁ শ্যাটাস।'

বিচার শুরু হলো।

স্পেশ্যাল প্রসিকিউটর পিটার দেমনিদেস জুরিকে তাঁর কেস বোঝাচ্ছে। ও খানিকটা নার্ভাস। কোনো কেসে সে এপর্যন্ত নেপোলিয়ঁকে হারাতে পারেনি।

কিন্তু প্রসিকিউটর সহজে হাল ছাড়বেনা। তার বক্তব্য, 'স্বামীকে ভালোবাসতো শুধুমাত্র এই অপরাধে খুন হয়েছে ক্যাথরিন ডগলাস। ল্যারী ডগলাস ও হেলেন পেইসের পথের কাঁটা হয়েছিলো সে। তাই তাকে হত্যা করা হলো…'

আস্তে আস্তে, জড়িয়ে কথা বলে নেপোলিয়ঁ, 'হেলেন পেইস এখানে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত নয়। কোনো খুন হয়নি। এখনো ডেডবডি পাওয়া যায়নি। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ক্লায়েন্টের অপরাধ, সে অলিখিত একটা আইন ভেঙেছে। যে অলিখিত আইন বলে, অন্য মেয়ের স্বামীর সঙ্গে ব্যভিচার সমাজের চোখে অন্যায়। তাই প্রেস ও পাবলিক তার শাস্তি চাইছে। বেশ, ভালো কথা। সে আইন ভেঙেছে। তার শাস্তি হবে। কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, মার্ডার তো সে করেনি। তার অপরাধ, সে বিখ্যাত এক কোটিপতির রক্ষিতা। ভদ্রমহোদয়গণ, ওই তো আপনাদের সামনে মিষ্টার লরেন্স ডগলাস ও মিস পেইস। ওদের কী অপরাধীর মতো দেখাচ্ছে? পরস্পরকে ওরা ভালোবাসে? হয়তো।

কিন্তু মার্ডারার? না। আমি নিশ্চিত, এবং আমি আপনাদের সামনে প্রমাণ করবো যে ওরা নিরপরাধ। লরেন্স ডগলাসের উকিল ফ্রেডরিক স্ট্যাব্রস। তাঁর ক্ষমতায় আমার আস্থা আছে। কিন্তু স্টেট বলছে, দুজনে ষড়যন্ত্র করে খুন করেছে। সুতরাং একজন অপরাধী হলে অন্যজনও অপরাধী। আমি বলছি, দুজনেই নির্দোষ।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফ্রেডরিক স্ট্যাব্রস। হেলেন পেইস বেকস্থর খালাস হয়ে ল্যারী ডগলাসের শাস্তি হলে, তার সর্বনাশ। কিন্তু এখন নেপোলিয়ঁ দুজনকেই নির্দোষ প্রমাণ করতে চলেছে।

'আমার ক্লায়েন্ট জানে না, ক্যাথরিন ডগলাস জীবিত না মৃত। জুরিমহোদয়গণ, আপনারাই বলুন, কী করে জানবে? আমার ক্লায়েন্ট হেলেনের সঙ্গে জীবনে কখনো দেখা হয়নি, পরিচয় হয়নি ক্যাথরিনের যাকে চোখে দেখেনি, তাকে কেউ খুন করতে পারে? হয়তো ল্যারী ও হেলেনের প্রেমের ব্যাপারটা জেনে মনে আঘাত পেয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে ক্যাথরিন। আপনারা বলুন, কিসের অভাব ছিলো কোটিপতির রক্ষিতা হেলেনের? তবু সে ভালোবাসার মানুষের জন্যে সবকিছু ছাড়তে চেয়েছিলো। এটা কী খুনীর চরিত্র?'

ল্যারী ডগলাস আড়চোখে তাকাচ্ছে হেলেনের দিকে। না, সে হেলেনকে ভালোবাসেনা। শুধু অতীত কামনার ক্ষীণ স্মৃতি জাগে। কেন যে একটা মেয়ের জন্য নিজের জীবন নিয়ে জুয়ো খেলেছে? প্রেস বক্সের এক যুবতী রিপোর্টারের দিকে তাকিয়ে হাসে ল্যারী। মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সাক্ষীকে জেরা করছেন প্রসিকিউটর।

'আপনার নাম ও জীবিকা?'

'অ্যালেকসিস মিনোস। অ্যাটরণী।'

'লরেন্স ডগলাস ছমাস আগে কেন আপনার সঙ্গে দেখা করেন?'

'উনি ডিভোর্স চাইছিলেন।'

'আপনি কী বললেন?'

'বললাম, স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া ডিভোর্স পাওয়া শক্ত।'

সুতরাং চূড়ান্ত কিছু একটা না করলে ডিভোর্স পাওয়া লরেন্স ডগলাসের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা?'

'অবজেকশন!' নেপোলিয়ঁ বললেন।

'অবজেকশন সাসটেনড!' বিচারক জানালেন, 'আপনি সওয়াল করুণ।'

নেপোলিয়ঁ উঠে দাঁড়ালেন, 'মিষ্টার মিনেস, আপনি নামজাদা অ্যাটর্ণী, অথচ আমাদের আগে পরিচয় হয়নি বলে অবাক হলাম। আপনি কী ব্যবসা-সংক্রান্ত বা ট্যাক্স-সংক্রান্ত কেস দেখেন?'

'না'

'তাহলে কী ধরনের কেস আপনি করেন?'

'সবই ডিভোর্স কেস।'

'আমি জানতাম না, তবে আমার বোঝা উচিত ছিলো যে, আমার বন্ধু মিস্টার দেমনিদেস এ কেসে ডিভোর্স সংক্রান্ত এক্সপার্টকেই ডাকবেন।

'ধন্যবাদ স্যার।'

'ডিভোর্স কেস সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বড্ড কম। আন্দাজ, বছরে কত ক্লায়েণ্ট হয়? বলুন না, বিনয় করবেন না, আমি জানি, এব্যাপারে আপনি বিশেষজ্ঞ···'

'প্রায় দুশোটা।'

দুশো ডিভোর্স বছরে? কাগজপত্র তো এতো হবে···

'না, সব কেস ডিভোর্স হয়না তো।'

'মানে? আপনার সব কেসই তো ডিভোর্স কেস?'

'তা বটে। তবে সব কেসে ডিভোর্স হয়না। অনেকে পরে মত বদলায়।'

'কতোজন মত বদলায়? শতকরা দশজন হবে?'

'না, তার বেশী।'

'পনেরো? কুড়ি?'

'না, প্রায় শতকরা চল্লিশজন।'

'মিস্টার মিনোস, যারা আপনার কাছে আসে, তাদের প্রায় অর্ধেক শেষ অবধি ডিভোর্স করেনা? কেন? আপনার দোষ নয় নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই না। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করলো, স্বামী বা স্ত্রী রাগের মাথায় প্রথমে ডিভোর্স করতে চাইলো, পরে মত বদলে···

'ধন্যবাদ, আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মিনোস।'

দ্বিতীয় সাক্ষী মিসেস কাসটা, এথেন্সের একশো কিলোমিটার উত্তরে সমুদ্র তীরের রাফিনা গ্রামের এক ভিলার হাউসকিপার।

পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, 'দুই অপরাধী হেলেন ও ল্যারী ওখানে পাশের ভিলায় থাকতো। বীচে আমি ওদের উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি।'

নেপোলিয়ঁ জেরা করেন, 'সাত বছর ভিলার হাউসকিপার আপনি? তাহলে তো খুব অভিজ্ঞ। রাফিনা বীচে বাড়ি কেনার কথা আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু ভিলাগুলো তো একদম ঘেঁষাঘেঁষি···

'না, স্যার। প্রত্যেকটা ভিলা দেয়াল দিয়ে ঘেরা।'

'না, স্যার। একটা ভিলা থেকে অন্যটা একশো মাইল দূরে। একটা তো বিক্রির কথা হচ্ছে। কিনলে আমার বোনকে হাউসকিপার রাখতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, মিসেস কাস্টা, আজ বিকেলেই ফোন করবো। কটায় ফোন করবো?'

'সন্ধ্যে ছটার পর।'

'এখন কটা বাজছে?'

'আমার হাতে হাতঘড়ি নেই।'

'সামনের দেয়ালে ঘড়ি আছে। কটা বাজছে?'

'অনেকটা দূরে। ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

'কতো দূরে?'

'প্রায় পঞ্চাশ ফুট।'

'পঁচিশ ফুট, মিসেস কাস্টা। আর কোনো প্রশ্ন করবো না।'

...পরবর্তী সাক্ষী প্রাইভেট ডিটেকটিভ ক্রিশ্চিয়ান বারবেইৎ।

বারবেইৎ কোর্টকে জানালো, 'মিস হেলেন পেইস ল্যারী ডগলাসের সম্বন্ধে খোঁজ নিতেন। অন্ততঃ ছ'বছর আগে ওঁদের প্রেমের ব্যাপারটা শুরু হয়।'

পাবলিক প্রসিকিউটরের জেরা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন নেপোলিয়ঁ।

'মিস্টার বারবেইৎ, আপনার স্যুটটা চমৎকার। মেড ইন প্যারী, তাই না? শুনেছি ইংল্যাণ্ডের দর্জিদের কাটিং খুব ভালো। আপনি তো অনেকবার ইংল্যাণ্ডে গেছেন, তাই না?'

'না।'

'আমেরিকা ? সাউথ প্যাসিফিক ?,

'না'

'তাহলে ল্যারী যখন ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, সাউথ প্যাসিফিকে ছিলো সেখানকার রিপোর্ট দিলেন কী করে ?'

'ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার এজেন্সিতে খোঁজ নিয়ে।'

তাইতো, বোকার মতো কথা বলছিলাম। ইওর অনার, এই সাক্ষীর সম্পূর্ণ সাক্ষ্য আদালতের কার্যবিবরণী থেকে বাদ যাবে। ওর দেওয়া রিপোর্টগুলো সাক্ষ্য নয়, অন্যের কাছ থেকে পাওয়া খবর।'

প্রধান বিচারক বললেন, 'প্রসিকিউটর, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড থেকে কোনো প্রমাণ কোর্টের সামনে আনা হবে ?'

'অসম্ভব, স্যার।'

'তাহলে মিস্টার নেপোলিয়ঁর বক্তব্য গৃহীত হলো।'

পরবর্তী সাক্ষী ইওয়ান্‌নিনার প্যালেস হোটেলের ক্লার্ক জর্জ ম্যুসঁ জানালো, ল্যারী ডগলাস বলেছিলো, 'তার বউ ওহা দেখতে চায়। কথাটা আমার অবিশাস্য মনে হয়ে ছিলো…'

নেপোলিয়ঁ বললেন, মেয়েরা দুর্গম কোনো অভিযানে অংশ নিতে চায়না বলছেন ? ওনা জনসন, অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট বা মারগারেট সীডের নাম শুনেছেন ?,

'না, স্যার ?'

'বিয়ে করেছেন ?'

'তিনবার বিয়ে করেছি। তবে এখন…মেয়েদের স্বভাব আমি বুঝি।'

'মিস্টার ম্যুসঁ, মেয়েদের সম্বন্ধে এক্সপার্ট হলে একটা বিয়েই আপনি টিকিয়ে রাখতে পারতেন। না, আর কোনো প্রশ্ন করবোনা আপনাকে।'

পরবর্তী সাক্ষী পেরামার গুহার একজন গাইড ক্রিস্টফার কোসায়নিস্।

'মিস্টার ল্যারী ডগলাসকে তুমি আগে কখনোও দেখেছো?'

'হ্যাঁ, আগস্ট মাসে উনি গুহায় বেড়াতে আসেন।'

'হাজার হাজার ট্যুরিস্ট আসে। ওঁকে অত মনে রাখার কারণটা কী?' পাবলিক প্রসিকিউটর জানতে চায়।

'প্রথমত: উনি গাইড নিলেন না। জারমান ও ফরাসীরা কনজুস হয়। কিন্তু আমেরিকানরা দরাজ দিল. ওরা গাইড নেয়।'

'এছাড়া ওঁকে মনে রাখার অন্য কারণ আছে?'

'হ্যাঁ। সেদিন উনি গাইড না নেওয়ায় ওঁর সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে বিব্রত মনে হয়েছিলো। ঘণ্টাখানেক পরে দেখলাম, উনি ছুটে বেরোচ্ছেন গুহার প্রবেশ পথ থেকে। সঙ্গে কেউ নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রমহিলার কোনো বিপদ বা আ্যাক্সিডেণ্ট হয়নি তো?' উনি বললেন—'কোন মহিলা?' আমি বললাম, 'যে মহিলার সঙ্গে গুহায় ঢুকেছিলেন আপনি?' তখন হঠাৎ উনি চিৎকার করতে আরম্ভ করলেন, 'সে গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে। আমায় সাহায্য করো··· ···'

'কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা করার আগে পর্যন্ত উনি সাহায্য চাননি?,

'না'

'তারপর কী হলো?'

'গাইডদের দিয়ে সার্চ পার্টি ভেতরে গেলো। গুহার যেখানটা নতুন খোঁড়া হয়েছে, সেখানটায় 'বিপজ্জনক' বলে নোটিস ছিলো। তিন ঘণ্টা পরে আমরা মহিলাকে খুঁজে পাই।'

'শেষ প্রশ্ন। ভেবে জবাব দিন। মিস্টার ডগলাস যখন গুহা থেকে একা বেরিয়ে এলেন ওঁকে আপনার কী মনে হয়েছিল? উনি চলে যাচ্ছেন না সাহায্য চাইছেন।'

'উনি চলে যাচ্ছিলেন।'

'মিস্টার কোসায়নিস, আপনি কী মনস্তত্ত্ববিদ?'

'না স্যার, আমি গাইড।'

'আপনার অলৌকিক মানসিক ক্ষমতা আছে?'

'না, স্যার।'

'এখানে আমরা হোটেলের কেরানীকে দেখলাম, সে নাকি মনস্তত্ত্ব বিশারদ। আই উইটনেসকে দেখলাম, সে দূরের জিনিস চোখে দেখতে পায়না। এখন আপনি বলছেন, উত্তেজিত আতংকিত একটা মানুষের মুখ দেখে তার মনের কথা আপনি বুঝে গেলেন? কী করে বুঝলেন?'

'ওকে দেখে মনে হচ্ছিলো, সাহায্য চাইবার ধান্দা ওর ছিলোনা। ও পালাবার ধান্দায় ছিলো।'

'এসব মনে রাখার জন্য দারুণ স্মৃতিশক্তি দরকার। হাজার হাজার দর্শক আসে। তাদেরই একজনের কথা এতো ভালোভাবে মনে রেখেছেন আপনি। আচ্ছা বলুনতো, মিস্টার ডগলাস ছাড়া এই কোর্টরুমের অন্য কাউকে কখনো গুহায় দেখেছেন?'

'না, স্যার।'

'আমায় আগে কখনো দেখেছেন?'

'না, স্যার।'

'এটা দেখুন। পেরামার গুহায় ঢোকার টিকিট। তিন সপ্তাহ আগের। আরো পাঁচজন ছিলো আমার সঙ্গে। আপনিই গাইড ছিলেন, মিস্টার কোসায়নিস। যাক্, আর কোনো প্রশ্ন করবোনা।'

ল্যারী ডগলাসের অ্যাটর্ণী ফ্রেডারিক স্ট্যাভ্রস সম্পূর্ণ নির্ভর করছে হেলেন পেইসের উকিল নেপোলিয়ঁর সওয়ালের ওপর। কিন্তু ম্যাজিক

ছাড়া বোধহয় ওদের দুজনের বেকসুর খালাস পাওয়া সম্ভব নয়। এখনো কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস আদালতে আসেনি। তার চেয়ারটা শূন্য। যদি হেলেনের শাস্তি হয়, ডেমেরিস দেখতে আসবেনা। যদি ডেমেরিস আসে বুঝতে হবে, হেলেন বেকসুর খালাস পাবে।

শুক্রবার বিকেলে বিস্ফোরণ ঘটলো।

প্রসিকিউটর সাক্ষীকে জেরা শুরু করলেন—

'ডক্টর জন কাজেমিডেস, আপনি মিস্টার ও মিসেস ডগলাসকে আগে কোথাও দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, পেরামার গুহায় হারিয়ে গিয়েছিলেন মিসেস ক্যাথরিন ডগলাস। সার্চপার্টি যখন ওঁকে খুঁজে পেলো, দেখা গেলো, ক্যাথরিনের হাত ও গাল পাথরের খোঁচায় ছিঁড়ে গেছে, মাথায় চোট লেগেছে। আমি যন্ত্রণা কমার ওষুধ দিয়ে প্রাথমিক শুশ্রূষা করে ওকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইলাম। ওর স্বামী বললো, 'না, প্যালেস হোটেলে রাখা হোক, ও নিজে সেবা করবে। জ্ঞান ফিরলে ক্যাথরিন ডগলাস আমায় বলে, তার স্বামী তাকে খুন করতে চাইছে।'

পাঁচ মিনিট পরে কোর্টরুম শান্ত হলো। নেপোলিয়ঁ হেলেনের সঙ্গে কিসব কথা বলছে। দুজনেই উত্তেজিত।

'আমি ওকে ঘুমের ওষুধের ইনজেকশন দিলাম। ক্যাথরিন কিন্তু বারণ করেছিলো। সে বলেছিলো, তার ঘুমের মধ্যেই তার স্বামী তাকে খুন করবে।'

প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কোর্ট বললেন, 'কারণটা ও নিজে বলেছিলো?'

'ইয়েস ইওর অনার।'

'প্রসিকিউটর, আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।'

'ডক্টর কাজোমিডেস, আপনি ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছিলেন ক্যাথরিনকে। সুতরাং পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কারোও বিনা সাহায্যে উঠে পোষাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ক্যাথরিনের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা ?'

'ওই অবস্থায় ? সম্ভাবনা খুবই কম।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

জুরিমহোদয়গণ হেলেন ও ল্যারীর দিকে তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিটা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। আতংকিত অসহায় এক মহিলা, ঘুমের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে তাকে। সে ডাক্তারকে অনুরোধ করছে, আমায় খুনী স্বামীর কাছে একা ছেড়ে যেওনা। এই ছবিটা জুরিদের মন থেকে মোছা নেপোলিয়ঁর পক্ষেও অসম্ভব।

ফ্রেডরিক স্ট্যাভ্রস আতংকিত। সে কী উঠে দাঁড়াবে, ডাক্তারকে ক্রশ একজামিন করবে ? কিন্তু নেপোলিয়ঁ উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইওর অনারস, আমি ক্রশ-একজামিন করতে চাইনা। কোর্ট ও সরকারপক্ষের কৌঁসুলীর সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলতে চাই। আদালত ততোক্ষণ মুলতুবী থাক.....'

'মিস্টার দেমনিদেস ?'

'নো অবজেকশন।'

কোর্টের রিসেস। কিন্তু একজন দর্শকও চেয়ার ছেড়ে উঠলোনা।

বিল ফ্রেজারের চোখে সন্তুষ্টির দীপ্তি। ডাক্তারের সাক্ষ্যের পর আর সন্দেহ রইলোনা যে ল্যারী ও হেলেন ক্যাথরিনকে মার্ডার করেছে।

আধ ঘণ্টা পরে হাসতে হাসতে কোর্টরুমে ঢুকে নেপোলিয়ঁ বললেন, 'প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কোর্ট অনুমতি দিয়েছেন। মিস পেইস, ভেতরে চলুন। মিস্টার স্ট্যাভ্রস, আপনি ও আপনার মক্কেল আসতে পারেন।'

ভেতরে ঢুকে নেপোলিয়ঁ বললেন, 'বিচারকদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম, ওঁদের ধারণা হয়েছে যে তোমরা দোষী। তবে আমি ওদের বুঝিয়েছি···তোমরা দোষ স্বীকার করলে তোমাদের মাত্র পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হবে। তার মধ্যে চার বছর পরে মাফ করে দেবে। ছমাসের বেশী জেল খাটতে হবেনা তোমাদের। মিস্টার ল্যারী ডগলাস তুমি আমেরিকান। তোমাকে গ্রীস থেকে আমেরিকায় পাঠানো হবে। মিস হেলেন তোমার পাসপোর্ট ক্যানসেল করা হবে। তুমি এখানে থাকবে, তোমার দেখাশোনা করবে তোমার গ্রীক বন্ধু। তাঁর প্রভাবের ফলেই আদালত তোমাদের সম্বন্ধে নরম মনোভাব নিতে রাজি হয়েছে। এই কেসে এমনিতেই তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পাবলিসিটি হয়েছে। এখন এসবের শেষ হোক এটাই তিনি চাইছেন।'

সুতরাং কোটিপতি কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস তার কথা রেখেছে। হেলেন জানে, ডেমেরিসের সুনাম বা বদনাম হলো বিচারকদের তাতে কিছুই যায় আসেনা। এর জন্যে চড়া দাম দিতে হয়েছে কোটিপতিকে। প্রতিদানে সে ফিরে পাচ্ছে হেলেনকে ও থাকবে গ্রীসে, গ্রীসের বাইরে যাওয়ার পাসপোর্ট বাতিল হবে। ল্যারী ডগলাস থাকবে গ্রীসের বাইরে, তার গ্রীসে ঢোকার উপায় থাকবেনা। সুতরাং ডেমেরিসকে ছেড়ে আর ল্যারীর কাছে যেতে পারবেন' হেলেন। প্রভাবশালী মানুষ যা দাবী করে তাই পায় এমনকি যে কোনো নারীকেও.....

ল্যারীর দিকে তাকালো হেলেন এ প্রস্তাবে ল্যারী খুব খুশি। মাত্র ছমাস জেল খেটে সে রেহাই পাবে, তার প্রাণদণ্ড হবেনা। সেটাই বড় কথা।

এসবে অবাক হয়না হেলেন।

সে জানে, ল্যারীর স্বভাব তারই মতো। জীবনের জন্য প্রচণ্ড পিপাসা প্রচণ্ড ক্ষুধা দুজনেরই। পৃথিবীর মানুষের তৈরী আইন তাদের দুজনের ক্ষেত্রেই খাটেনা। ল্যারীর জন্য মনখারাপ লাগবে তার। কিন্তু, হেলেনের কাছেও প্রেমের চেয়ে জীবন বড়। এই জীবন হারাতে ভয় হয় তার। সুতরাং প্রস্তাবটা ভালো। সে নেপোলিয়ঁ শুটাসকে বলে, আমি রাজি।

নেপোলিয়ঁ শুটাসের চোখে সন্তুষ্টির সঙ্গে বেদনা জেগে ওঠে। সে হেলেনকে ভালোবাসে। নেপোলিয়ঁ তাকে বাঁচাতে পারে, একমাত্র এই আশাতে হেলেন তার কথায় সায় দিচ্ছে।

ল্যারী ডগলাসের অ্যাটর্ণী বলছে, 'চমৎকার দারুণ—'

স্ট্যাড্রস ভাবছিলো, অঘটন সত্যিই ঘটে। যদিও মূল ভূমিকা নেপোলিয়ঁর, উকিল হিসেবে এমন ফ্রেডরিক স্ট্যাড্রসের জনপ্রিয়তাও বাড়বে।

ল্যারী ডগলাস বলে, 'ব্যবস্থাটা মন্দ হলোনা। তবে আমরা আসলে নির্দোষ। আমরা ক্যাথরিনকে খুন করিনি।'

ফ্রেডরিক স্ট্যাড্রস-খিঁচিয়ে ওঠে, 'তোমরা দোষী না নির্দোষ তা নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে? তোমাদের জীবন আমরা উপহার দিচ্ছি বলতে পারো।' আমরা দোষী স্বীকার না করলে কী হবে?'

'জুরি—'

'আমি মিস্টার নেপোলিয়ঁ শুটাসের মত জানতে চাইছি।'

নেপোলিয়ঁ বলে, 'মিস্টার ডগলাস, অভিযুক্ত অপরাধী দোষী না নির্দোষ সেটা বিচারের সময় বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, সব শুনে জুরিদের কী ধারণা হচ্ছে, বিচারক কী ভাবছে। চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই, সত্যের আপেক্ষিক মূল্যায়নই বড় কথা। এই কেসে আপনারা

দোষী না নির্দোষ, সেটার কোনো গুরুত্বই নেই। জুরিদের ধারণা হচ্ছে, আপনারা দোষী। শেষ অবধি আপনাদের প্রাণদণ্ড হতো।'

'ও কে, এই প্রস্তাবে আমি রাজি।'

পনেরো মিনিট পরে দুই আসামী মুখোমুখি দাঁড়ালো তিনজন বিচারকের মুখোমুখি।

ল্যারী ডগলাসের পাশে ফ্রেডরিক স্ট্যাভ্রস। নেপোলিয়ঁ শ্যাটাসের পাশে হেলেন পেইস। নাটকীয় কিছু একটা ঘটবে বুঝে দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য। নেপোলিয়ঁ বললেন 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইওর অনার্স আমার ক্লায়েন্ট অপরাধ স্বীকার করছে।'

প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কোর্ট অবাক হয়ে তাকালো। যেন খবরটা উনি প্রথম শুনলেন। লোকটা ভালো অভিনেতা, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হেলেন ভাবছিলো। ডেমেরিসের টাকা খেয়েছে, এখন অবাক হওয়ার ভাণ করছে।

'মিস হেলেন পেইস, তুমি অপরাধ স্বীকার করছো?'

'হ্যাঁ', হেলেনের গলা কাঁপলোনা।

ফ্রেডরিক স্ট্যাভ্রস তাড়াতাড়ি বললো, 'আমার ক্লায়েন্টও অপরাধ স্বীকার করছে. ইওর অনার্স।'

'মিস্টার ল্যারী ডগলাস ও মিস হেলেন পেইস, তোমাদের অ্যাটর্ণীরা কী তোমাদের জানিয়েছে, গ্রীক আইনে পূর্বপরিকল্পিত খুনের শাস্তি প্রাণদণ্ড?'

'ইয়েস, ইওর অনার্স,' হেলেন বলে।

'ইয়েস স্যার,' ল্যারী জানায়।

'মিস্টার দেমনিদেস, সরকারপক্ষের কোনো আপত্তি আছে?'

নেপোলিয়ঁর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, 'না।'

'জুরিমহোদয়গণ, আপনাদের ছুটি। এখন দুঘণ্টার জন্যে আদালত মুলতুবী থাকবে। দুঘণ্টা পরে রায় দেবে আদালত।'

রিপোর্টাররা টেলিফোন ও টেলিটাইপ মেশিনের দিকে ছুটে যায়।

দুঘণ্টা পরে জনাকীর্ণ আদালতকক্ষে দর্শকেরা হেলেনের দিকে তাকায়। ওর প্রাণদণ্ড হবে। গণতন্ত্রে সব মানুষের সমান অধিকার। বড়লোক বলে কেউ খুন করে রেহাই পায়না। ওদের মনের কথা বুঝে হাসি চাপে হেলেন। এই পৃথিবীর উঁচু মানুষের দাবী সব মুঠোয় নেয়, বিচার এবং নারীকেও নিয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কোর্ট বলছেন, 'এই কেস দীর্ঘ ও জটিল। খুনের মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যাপারে সামান্যতম সংশয় থাকলে সন্দেহের খাতিরে আসামীকে রেহাই দেয় আদালত। এক্ষেত্রে স্টেট যে নিহত ক্যাথরিনের ডেডবডির সন্ধান পায়নি, এটা অপরাধীর স্বপক্ষে একটা বড় বক্তব্য ছিলো। আসামীপক্ষের বিচক্ষণ আইনজীবী জানেন যে খুনের কেসে নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া গ্রীক আদালত কখনো প্রাণদণ্ড দেয় না।'

হেলেনের মনের আড়ালে আতংকের ইঙ্গিত জাগে। প্রেসিডেন্ট বলছেন, 'বিচারের মাঝপথে আসামীরা অপরাধ স্বীকার করায় আমরা খুবই অবাক হয়েছি।'

হেলেনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বিস্ফোরিত চোখে বিচারকের দিকে তাকিয়ে আছে ল্যারী। ব্যাপারটা কী ঘটছে?

'যে অনুতাপ, যে মানসিক যন্ত্রণার ফলে তারা অপরাধ স্বীকার করেছে আদালত তার গুরুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু অনুতাপ এই ভয়ংকর ক্রাইমের

একমাত্র শাস্তি নয়। তারা এক অসহায় রমণীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে।'

এতোক্ষণে হেলেন বুঝতে পারে, তাকে বোকা বানিয়েছে ডেমেরিস। ডেমেরিস তার মনে নিরাপত্তার মিথ্যা আশ্বাস জাগিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলেছে। ডেমেরিস্ জানে, মরতে ভয় পায় হেলেন, তাই জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলেছে। ডেমেরিস প্রতিশোধ নিচ্ছে। কেননা নেপোলিয়ঁ জানতো, যেহেতু আদালতে ডেডবডি সংক্রান্ত কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারেনি সরকারপক্ষ, অতএব কখনোই প্রাণদণ্ড হবেনা হেলেনের। সে বিচারকদের কিছুই বলেনি। কৌশলে সে হেলেনের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেছে। ল্যারীর সাথে সম্পর্কের প্রতিশোধ নিচ্ছে ডেমেরিস।

নোপোলিয়ঁর দিকে তাকালো হেলেন। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ক্রিমিন্যাল লইয়ারের চোখে বিষাদ। হেলেনকে তার ভালো লেগেছিলো। কিন্তু সে কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিসের উকিল, এটা হেলেন ডেমেরিসের লড়াই। ডেমেরিস প্রভাবশালী তার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

প্রেসিডেন্ট বিচারের রায় পড়ে শোনালেন, 'আইন অনুযায়ী হেলেন পেইস ও লরেন্স ডগলাসকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। আজ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে এই প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে।

শূন্য চেয়ারে এখন বসে আছে কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস। সস্তা দাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা। পরণে র-সিল্কের নিখুঁত নীল রঙের স্যুট, হাল্কা নীল সার্ট, টাই। ভেঙে পড়া যে মানুষটা হেলেনের সঙ্গে জেলে দেখা করতে এসেছিলো, এ সে নয়। কারণ তার অস্তিত্বই ছিলোনা। সবটাই অভিনয়।

হেলেনের পরাজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তটা দেখতে এসেছে কনস্ট্যানটাইন ডেমেট্রিস। সে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। গভীর সন্তুষ্টির সঙ্গে ঘৃণা মেশানো সে দৃষ্টিতে। আরো কী যেন ছিলো। পরিতাপ? কিন্তু শুধু লহমার জন্যে তা দেখা গেলো। দাবা খেলা এবার শেষ।

…এবং প্রহরীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যেয়ে ল্যারী ডগলাস চিৎকার করেছিলো।

'ওয়েট এ মিনিট! শোনো! আমার কথা শোনো। আমি খুন করিনি!' তার হাতে হাতকড়া লাগানো হয়। তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় আদালতকক্ষ থেকে।

'মিস পেইস, ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

যেন নাটক শেষে অভিনেত্রীর ডাক এসেছে। কারটেন কল। দর্শকেরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। শুধু এইটুকু তফাৎ, এই যবনিকাপতনের পর যবনিক আর উঠবেনা। জীবনের এই শেষবার দর্শকের সামনে দেখা দেবে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হেলেন পেইস। চিরবিদায়ের আগে দর্শকের সঙ্গে অভিনেত্রীর শেষ দেখা এই কোর্ট-রুমে। এই তার শেষ থিয়েটার। উদ্ধত ভঙ্গীতে চারপাশে তাকায় হেলেন শেষবার। এখনো আমার এতো দর্শক, সে ভাবে। সে দেখে, নিশ্চুপ, স্তম্ভিত আরমাঁদ একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ পরিচালক দেখছে, চূড়ান্ত পরাজয়ের পর শেষ বিদায়ের মুহূর্তে কেমন করে পরাজয়কে জয়মাল্য করে বরণ করতে পারে ইউরিপিদিসের নায়িকা।

ফিলিপ সোরেইল। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ অভিনেতা রুক্ষ মুখে হাসি ফুটিয়ে হেলেনকে ভরসা দিতে চাইছে।

এবং চোখ বুজে নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে ফরাসী বিপ্লবী বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা, আজকের বিখ্যাত নিউরোসার্জন ইজারয়েল কাৎজ্। হেলেন ভাবছে সেই রাতের কথা। যখন সে গেস্টাপো অফিসারের নজর এড়িয়ে জেনারেলের গাড়ীর ট্রাংকে পাচার করেছিলো ডাক্তারকে। সেদিনও হেলেনের মনে আতংক জেগেছিলো। আজকের আতংকের তুলনায় তা কিছুই নয়।

আগস্টে লাঁশাঁ। শূয়োরের মতো মুখ, মোটা শরীর যেন হেলেনের চেনা। ভিয়েনার হোটেলের বিশ্রী ঘরের স্মৃতি মনে আসে। হেলেনের দৃষ্টির সামনে লোকটা চোখ নামিয়ে নেয়।

এবং দীঘল চেহারার এক সুপুরুষ আমেরিকান কী যেন বলতে চাইছে। কিন্তু বিল ফ্রেজারকে চেনেনা হেলেন পেইস।

'চলুন মিস পেইস, মেট্রণ বলছে।

ফ্রেডরিক স্ট্যাভ্রস ভাবছে, নেপোলিয়ঁ শ্টাস যে প্রতিশ্রুতির ফাঁদে ফেলে তাকে ঠকালো, তা যদি সে কোর্টের প্রেসিডেন্টকে বলে? কেউ কী তাকে বিশ্বাস করবে? কোনো লাভ নেই। আইজীবী হিসেবে তার ভবিষ্যত খতম। অথচ নেপোলিয়ঁ বলছে, ফ্রেডরিক, কাল আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে? আমার পার্টনারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।'

'ধন্যবাদ, স্যার। কখন যাবো?'

গ্রীসে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় পাহাড়ঘেরা, সমুদ্রঘেরা ছোট্ট ইজিয়ানা দ্বীপে। ট্যুরিস্টদের দ্বীপের এই দিকটায় নিয়ে যাওয়া হয়না।

শনিবার সকাল। ভোর চারটা। ৬টায় প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে। লাল আধুনিক কাটিং-এর পোষাক, লাল জুতো, গলায় ভেনেসিয়ান লেসের স্কার্ফ—যেন পার্টিতে যাচ্ছে হেলেন।

যুক্তির দিক দিয়ে সে জানে, শেষ মুহূর্তে তার প্রাণদণ্ড রদ হবেনা। কিন্তু অনুভূতি বলছে, ইচ্ছে করলে শুধু ফোন করে ওটা রদ করতে পারে। কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস। কিন্তু, হেলেন প্রাণভিক্ষা চাইবেনা। ডেমেরিস যদি নিজে আসে, সে ডেমেরিসের জন্যে সবকিছু করবে। কিন্তু সে ডেমেরিসকে ডাকবেনা।

এখনো দুঘণ্টা বাকী।

জেলের অন্য এক সেলে ল্যারী ডগলাস। সারা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে মেয়েরা প্রেমপত্র পাঠাচ্ছে। কিন্তু ল্যারী ডগলাস পুনর্বিচারের দাবী জানিয়ে চেঁচামেচি করে। তাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে এলো ওয়ার্ডেন ও চারজন প্রহরী। যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে ল্যারী। করিডর, দরজা, তারপর দেয়ালঘেরা উঠোন। আকাশে চাঁদ, তারা। দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠা পড়ার শব্দ। এ কোন দ্বীপ? সাউথ প্যাসিফিক? এখানে তার মিশন? সামনে ইউনিফর্ম পরা মানুষ, তাদের বন্দুকের নিশানা তার দিকে। দৃশ্যপট বদলে যায়। কর্নেল ল্যারী ডগলাসের প্লেনটা ডাইভ খায়, আবার উঠে আসে। নিচে জারমান জীরো প্লেন। ট্রিগারবাটনে ল্যারীর আঙুল। হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণা। আবার, আবার। আমার থেকেও ভালো পাইলট?

লোকটা কে? ল্যারী ডগলাসের প্লেন মহাশূন্যে ঘুরছে। তারপর সব অন্ধকার, নিশ্চুপ।

সেলে হেলেনের হেয়ারড্রেসিং চলেছে। হঠাৎ বজ্রের শব্দ হলো বাইরে।

'বৃষ্টি হবে?'

'না, সুন্দর দিন।'

এবং তখন হেলেন বুঝতে পারে···এবার তার পালা।

বাবা বলতো, 'দেখলেই মনে হয় যেন রাজকন্যা।'

ছোট্ট হেলেনকে সবাই কোলে নিচ্ছে।

পাদ্রী বলছে, 'ঈশ্বরের কাছে সব স্বীকার করতে চাও?'

সে মাথা নাড়ে। এখন যেন বাবা বলছে—'তুমি রাজকন্যা। এই তোমার রাজ্য। বড় হয়ে তুমি সুন্দর এক রাজপুত্রকে বিয়ে করে প্রাসাদে থাকবে।'

'প্রিন্সেস, ওই দেখো তোমার নৌবহর। ওরা তোমায় পৃথিবীর আশ্চর্য সব জায়গায় নিয়ে যাবে।'

হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণা। মাংস ছিঁড়ে যাচ্ছে। না, এখনই না! আমাকে আমার বাবার মুখ দেখতে দাও! তারপর সব অন্ধকার।

সতেরো

কবরখানার ভেতর দিয়ে হাঁটছে পুরুষ ও রমণী। ছায়া পড়ে। পথের দুপাশের দীঘল সাইপ্রেস তাদের মুখে ছায়া ফেলে। মধ্যদিনের সূর্যের উত্তাপে তারা আস্তে আস্তে হাঁটছে।

কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস হাত নেড়ে বাধা দিয়ে বলে, 'ও কিছু নয়, সিস্টার।'

কিন্তু সিস্টার তেরেসা জানে, এই পরিত্রাতা না থাকলে কবেই বন্ধ হয়ে যেতো ধর্মযাজিকাদের এই প্রতিষ্ঠান। কতো বছর ধরে সাহায্য করে আসছেন কনস্ট্যানটাইন ডেমেরিস। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সিস্টার সেই ঋণের

সিস্টার তেরেসা বলছে, 'আপনার বদান্যতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনার সাহায্য ছাড়া···'

কিছুটা শোধ করতে পেরেছে। ঝড়ের সেই ভয়ংকর রাতে হ্রদের জলে ডেমেরিসের আমেরিকান বান্ধবীর নৌকোডুবি হয়ে ডুবতে দেখে সিস্টাররা যে তাকে উদ্ধার করেছিলো, সে জন্যে সেন্ট ডায়নিসাসকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে, বাচ্চা মেয়ের মতোন ব্যবহার করে। তবু ওর যত্নের কোনো ত্রুটি হবেনা। মিষ্টার ডেমেরিস অনুরোধ জানিয়েছেন, অবশিষ্ট জীবনটা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে এই কনভেন্টে যেন কাটাতে দেওয়া হয় ওই মেয়েটিকে। মিষ্টার ডেমেরিস খুব ভালো, খুব দয়ালু।

কবরখানার এক প্রান্তে ওদের শান্ত, পান্না রং জলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে এক রমণী।

তেরেসা বলে, 'ওই মেয়েটি। আমি চলি। বিদায়।'

সিস্টার চলে যেতে ডেমেরিস বলে, 'গুড মর্ণিং।'

শূন্য চোখে ফিরে তাকায় রমণী। কিন্তু চিনতে পারেনা।

'তোমার জন্যে উপহার এনেছি।'

জুয়েলারীর ছোট বাক্স। রমণী খোলে। ভেতরে সোনার তৈরী ছোট্ট পাখি, চুণির দুচোখ, ডানা মেলে উড়তে চাইছে। রোদের আলো

ঝিলিক দেয় সোনায়, চুণিতে। রামধনুর রঙ জাগে। রমণী দেখে।

ডেমেরিস বলে, 'আর তোমার সঙ্গে দেখা হবেনা। তুমি দুশ্চিন্তা কোরোনা। এখন আর কেউ তোমার ক্ষতি করবেনা। খারাপ লোকেরা মরে গেছে।

লহমার জন্য মুখ ফেরালো, রমণী। যেন বুদ্ধির একটু দীপ্তি, যেন দৃষ্টিতে খুশির ছোঁয়া। তারপর আবার সেই মননহীন, শূন্য চোখ। হয়তো সোনার পাখির বুকে প্রতিফলিত রোদের আলো চোখে পড়ে ওরকম দেখাচ্ছিলো।

কথাটা ভাবতে ভাবতে কনভেন্টের পাথরের তৈরী বিশাল সেটের দিকে হাঁটছিলো কনস্ট্যান্টাইন ডেমেরিস।

সেখানে লিমুসিন গাড়ী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। এথেন্সে ফিরে যাবে ও এখন।

— —